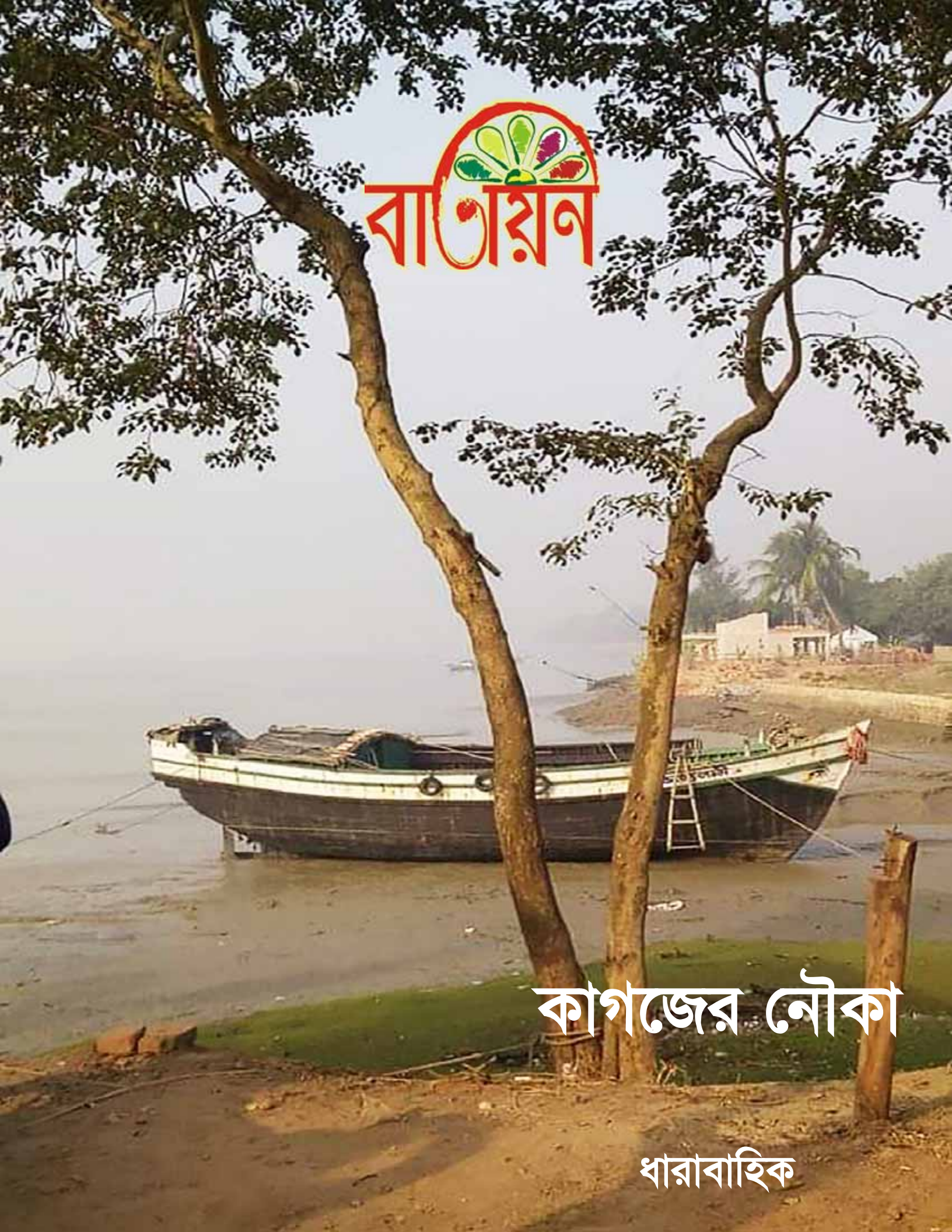

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

ধারাবাহিক

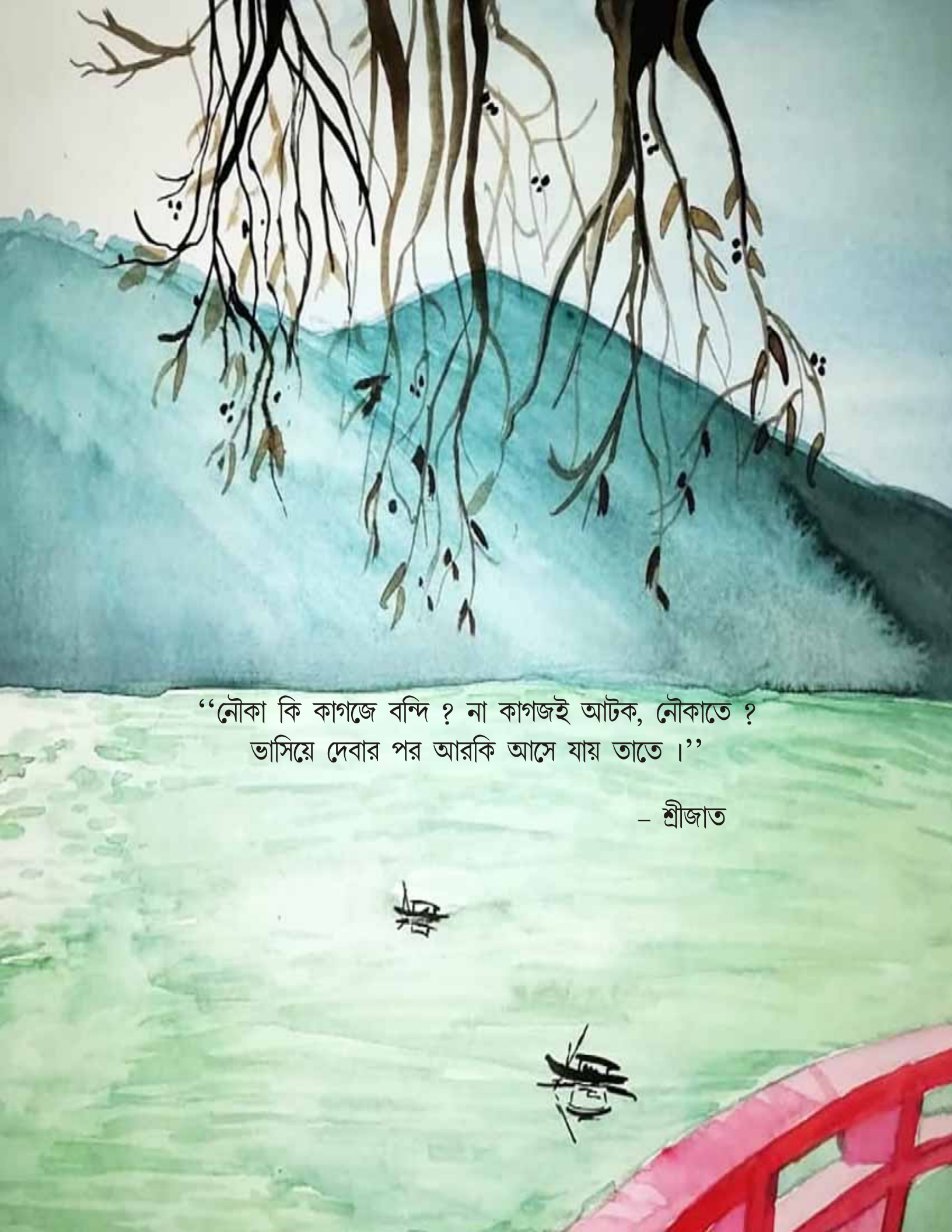

''নৌকা কি কাগজে বন্দি ? না কাগজই আটক, নৌকাতে ?
ভাসিয়ে দেবার পর আরকি আসে যায় তাতে ।''

– শ্রীজাত

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

পঞ্চম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৯

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 5 : February 2019

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication
Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Benjamin Ghosh — **Front & Front Inside Cover and Illustrations**

বেঞ্জামিন ঘোষ (মাঙ্গল্য) এখনো স্কুলছাত্র। তবে তার যাবতীয় আগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, ছবি আঁকাকে ঘিরে । পেন্সিল স্কেচ, রং-তুলি ছাড়াও সে ভালবাসে বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে নিয়মিত কমিক্স এঁকে চলেছে ছোটদের একটি শিক্ষামূলক পত্রিকার জন্য । বাতায়নের ধারাবাহিক পত্রিকায় বেঞ্জামিনের এই প্রথম কাজ । অতএব আমাদের সঙ্গে সেও তাকিয়ে আছে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার দিকে ।

''বাতায়নের ৫-এ পা'' — **Back Inside Cover**

Collective photos of programm held on 6th January, 2019

Tirthankar Banerjee — **Back Cover**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

বাতাসে বারুদের গন্ধ। আরো একবার, দুনিয়া জুড়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সন্ত্রাসবাদবিরোধী মানুষের প্রচেষ্টা ধাক্কা খেল। কাশ্মীরে নারকীয় জঙ্গীহানার ঘটনায়, ভারত তথা সারা বিশ্ব শোকস্তব্ধ।

তবে হতাশ হয়ে থেমে গেলে চলবে না। সাহিত্য, শিল্প যেন থমকে না থাকে। এই অসময়ের মুহূর্তেও গানে, কবিতায়, গল্পে, ছবিতে উচ্চারিত হোক মানবতার জয়গান, সত্য, শুভ আর অহিংসার মন্ত্রে জাগরূক হোক পরবর্তী প্রজন্মের সুচেতনা।

না, আমরাও থেমে নেই। বাতায়নের জন্য খুবই ঘটনাবহুল ছিল বছরের প্রথম দুটি মাস। প্রথমে ৬ই জানুয়ারি বাতায়নের "৫এপা" অনুষ্ঠান। নতুন-পুরাতন, স্বদেশ-প্রবাসের সফল মেলবন্ধন। আর তা নিয়ে আলোড়নের ঢেউ জানান দিল 'The Statesman' এর 'Kolkata Notebook' আর দৈনিক যুগশঙ্খ'তে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে।

"বর্ণমালার অন্ত্যমিলে মন মেতেছে খুবজোর / বাতায়নের ব'কলমে বইমেলাতে হুল্লোড়!"

সত্যিই এবার কোলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ছিল যেন বাতায়নময়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে বাতায়নের কর্ণধারের উপস্থিতি থেকেই তার সূচনা। বইমেলা ছেয়ে গিয়েছিল বাতায়নের শুভাকাঙ্ক্ষী আর একান্ত আপনজনেদের নানা স্বাদের বই'য়ে। তাঁদের মধ্যে যেমন শ্রীজাত, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় চক্রবর্তী, যশোধারা রায়চৌধুরী'র মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিকরাও ছিলেন, তেমনি উজ্জ্বল ছিলেন চুমকি চট্টোপাধ্যায়, পল্লববরণ পাল, শাশ্বতী নন্দী, ইন্দ্রাণী দত্ত, উপাসনা সরকার, মমতা দাস, দ্বৈতা হাজরাগোস্বামী, সিদ্ধার্থ দে, সুদীপ নাথ, শ্রীজাতা গুপ্ত এবং তরুণ তুর্কী স্বর্ভানু সান্যাল।

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?"

মাতৃভাষার জন্য ভুলতে না পারা এই দিনটা এবছর আরো স্মরণীয় হয়ে রইলো শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "দখিনা"য় বাতায়নের কুশীলবদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে।

কাগজের নৌকায় ধারাবাহিকগুলি অজানা বাঁকের মুখে। কৌতূহল চরমে। তারই মধ্যে এতদিনে বেশ কাছের লোক হয়ে ওঠা, বোধিসত্ত্ব, সুজাতা, মাধব, বা লাদাখের কর্মা শেরপাকে বিদায় জানাবার পালা। স্নেহাশিস ভট্টাচার্য-এর বড়গল্পের শেষপর্বে সব পেয়ে হারানোর শেষে বোধিসত্ত্ব আবার এসে বসল বটের তলায়, সুজাতা তাকে দিয়ে গেলেন . . . না, পায়েস না . . . একটা নীল ডায়রি।

আর হ্যাঁ, নজর রাখুন নতুন বিভাগ 'বইপাড়া'র দিকে, পাইলেও পাইতে পারেন . . . . অমূল্য রতন।

দোল আসছে। রঙের উৎসবে সবাইকে আগাম শুভেচ্ছা জানাই।

ভালো থাকবেন।

মানস ঘোষ
সম্পাদক / কাগজের নৌকা একটি বাতায়ন প্রকাশনা।

সূচীপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	5

স্মৃতিকথা

সিদ্ধার্থ দে	সুনীল সাগরে	20

বড় গল্প

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	অচেনা ঢেউয়ের শব্দ	26

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	সেল্ফি স্বরূপ	31

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	34

ভ্রমণ

মৌসুমী রায়	লাদাখ ভ্রমণ	36

বইপাড়া 39

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু

হটাবাহার

পর্ব ৫

(৯)

এ্যাডভোকেট অপূর্বরঞ্জন মল্লিক সুদীপাকে বললেন, বসতে অসুবিধে হচ্ছে ম্যাডাম ?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না সুদীপা প্রথমে । কেননা স্পষ্ট সাদা চোখে যা দেখা যাচ্ছে, এবং যার অন্যরকম কিছু ব্যবস্থা করারও উপায় নেই, সেখানে উত্তর দিয়েই বা লাভ কী ! বিকল্প যা, তা হচ্ছে এখান থেকে উঠে চলে যাওয়া । কিন্তু আপাতত সেটা সম্ভব নয় । সুতরাং এই খুপচি ঘরের মধ্যে, পনের বাই বারো ইঞ্চি কাঁঠাল কাঠের টেরা চেয়ারটায় বসে থেকেই উত্তর দিলেন, ন্ . . . না . . . ঠিক আছে ।

ঘরটির আয়তনও সুদীপার মনে হল ছয় বাই আটফুটের বেশি হবে না । তার মধ্যেই সামনের দরজা দিয়ে ঢোকার পরে একটি নড়বড়ে কাঠের টেবিল । তার ওপরে এবং মাঝখানে লাল-নীল সবুজ ফিতে দিয়ে বাঁধা অগুনতি রোগা-মোটা বাঁশ কাগজের ফাইলের স্তুপ । টেবিলের উলটো দিকেই বেঁটে চেহারার ফর্সা এবং গোঁফওয়ালা এ্যাডভোকেট অপূর্বরঞ্জন বসেছেন, সুদীপার মতোই একটি হাতল-বিহীন সংকীর্ণ চেয়ারে । তাঁর সামনে টেবিলের ওপর শুধু একটু ফাঁকা জায়গা । না, ঠিক ফাঁকাও না । কেননা সেই একটুখানি জায়গার মধ্যেই কলমদান - পেনপেন্সিল - ইরেজার - ক্লিপ - পিন - মৌরি - জলের গ্লাস - ছোট্ট কাপডিশ - দুটো ব্যাটারি - একগোছা চাবি - হজমিগুলির শিশি, স্কেল - রুলার - মোবাইল ফোন - শস্তার কাগজ . . . যাবতীয় যা কিছু । বাঁকানো টেবিল ল্যাম্পও একটা । টেবিলের দুপাশেই মক্কেলদের বসার জায়গা । একদিকে টানা বেঞ্চি একখানা । অন্যদিকে চারখানা চেয়ার, যার একটি এই মুহূর্তে সুদীপার দখলে । উকিল মশায়ের চেয়ারের পিছনে দেয়াল । একটি একপাতার বড় ক্যালেন্ডার এবং তারপাশে বহু পুরনো একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র সাঁটা দেয়ালে । দেয়ালের উপরাংশে র‍্যাক অথবা তক্তা । সেখানে পাশাপাশি সাজানো বাঁধাই করা বাৎসরিক ওকালতনামার মোটা মোটা রিপোর্টবুক । তারই মাঝখানে ধুলো মাখা আট ইঞ্চি সাইজের গণেশ মূর্তি । ঘরের সিলিং থেকে ঝোলানো একটি তিন ব্লেড-এর পাখা । এতো ছোট ব্লেডের পাখা সুদীপা কোনোদিন দেখেন নি । পাখাটি ঘুরছে . . . এটুকুই । একটি হলুদ রঙের ডুম ঝুলছে সিলিং-এর আর একপাশ থেকে, কিন্তু জ্বলছে না । দরকারও হচ্ছে না ।

টেবিলের ওপর বাঁশকাগজে খস খস করে কিছু লিখতে লিখতে উকিলবাবু সুদীপার উদ্দ্যেশে বললেন, কী করব বলুন ম্যাডাম . . . যস্মিন দেশে যদাচার . . . লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকার কেস-এর পর কেস হয়ে চলেছে এই কোর্ট থেকে . . . কিন্তু উকিল আর তাদের চেম্বারের অবস্থা যথাপূর্বং তথা পরম ।

সুদীপার পাশে একইরকম একটি চেয়ারে বসেছিল মাইতি । সুরঞ্জন বলে ওর যে একটা নাম আছে, বোধহয় অনেকেই তা জানেন না . . . কিংবা জানলেও অব্যবহারে বিস্মরণ হয়েছেন । মাইতির চেহারা ছোটখাট, উচ্চতা পাঁচফুট এক ইঞ্চিও বেশি না । বয়স অবশ্যই অর্ধশতাব্দী । মাথার চুল পাতলা, কলপ করা কালো । পরণে হাফহাতা জামা, ট্রাউজারস । আলিপুর কোর্টে মাইতিই সুদীপাকে নিয়ে এসেছে — তাঁর দখল হওয়া ফ্ল্যাট উদ্ধারের জন্য লইয়ারের সঙ্গে আলোচনা করতে এবং পরামর্শ নিতে ।

উকিলের কথা শুনে মাইতি বোধহয় তাঁকে কিঞ্চিৎ তুষ্ট করার অভিপ্রায়েই বলল, আপনার চেম্বারের অবস্থা তো তবু ভাল অপূর্বদা . . . বসার চেয়ার, মাথার ওপর পাখা আছে । অধিকাংশ উকিলের ঠেক তো গাছতলা . . . মক্কেল বসে ইঁটের ওপর . . . ।

অপূর্বরঞ্জন বললেন, না রে ভাই, ওই স্ট্যান্ডার্ডটা আর নেই । যখন শুরু করেছিলাম . . . বহু কালো কোট পাখির ইয়েতে আমারও সাদা হয়েছিল । তারপর বহু কষ্টে . . . বারো বছর আগে কুড়ি হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে অন্তত এটুকু . . . ।

মাইতি মাঝখানেই বলল, কুড়ি হাজার . . . অতবছর আগে !

তো কী . . . বেশি মনে হচ্ছে ! আরে মাইতিবাবু . . . এখন এর অর্ধেক ঘরও এই চত্বরের মধ্যে লাখের নীচে কথা বলে না . . . বুঝলেন ! মাইতি ঘাড় নাড়ল । — বুঝলাম । সঙ্গে জুড়ে দিল, মানে . . . কোর্টে ঢুকলে উকিলের রেহাই নেই আর কী . . . ।

সেদিকে আর কে দেখছে বলুন . . . অনেক মক্কেলেরই ধারণা কোর্টে ঢুকলে শুধু উকিলই নাকি গলা কাটে ।

কথা বলতে বলতেই চেম্বারের দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন অপূর্বরঞ্জন, সামন্ত . . . একবার এসো ।

সুদীপা খেয়াল করলেন, এই ঘরে ঢোকার সময়ই ঢ্যাঙ্গা লোকটিকে দরজার বাইরে টালি ঢাকা বারান্দায় বসে মান্ধাতা আমলের টাইপরাইটারে খটাখট করতে দেখেছিলেন । অর্থাৎ সামন্ত অপূর্বর টাইপিষ্ট, সহকারি . . . ইত্যাদি ।

সামন্তর হাতে কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে অপূর্ব বললেন, আট নম্বরের কার্তিকবাবুর কাছে যাও . . . আমার নাম করে এই কাগজটা দিয়ে অপেক্ষা কোরো । উনি একটা ফাইল বের করে দেবেন । নিয়ে সোজা চলে এসো । এক মিনিট . . . মাইতির দিকে ঝুঁকে অপূর্ব বললেন, সামন্তকে পাঁচশ'টা টাকা দিয়ে দিন . . . কার্তিকের জন্য । ম্যাডামের এগেইনষ্টে ওরা অলরেডি যে মামলা করেছে . . . সেই ওরিজিনাল ফাইলটা আমরা দেখে নেব আজই । ওঁর তো আবার তাড়া আছে . . . । কার্তিক কে বলা আছে ।

সুদীপার কানে সব কথাই যাচ্ছিল । মাইতি ব্যাকপকেটে হাত দিতে যেতেই বললেন, আমি দিচ্ছি মাইতি . . . ক্যাশ আছে । সুদীপার হাত থেকে টাকা নিয়ে মাইতি বাড়িয়ে দিল সামন্তর দিকে ।

অপূর্ব সামন্তকে বললেন, চলে যাও দেরি কোরো না . . . পথে আবার কারুর সঙ্গে গল্পো জুড়ে দিও না . . . ম্যাডাম বসে আছেন . . . ।

কী যে বলেন স্যার . . . । দাঁত বার ক'রে হেসে সামন্ত বেরিয়ে গেল ।

অপূর্ব সুদীপাকে বললেন, একটু কষ্ট করে বসুন ম্যাডাম . . . এসেছেনই যখন, কেসটা ফাইল করে দিতে পারলেই ভাল . . . কেননা তারপর তো আবার মামলার ডেট পেতে হবে . . . । ততক্ষণ একটু লেবু চা . . . ?

সুদীপা বললেন, না- না থ্যাঙ্ক য়্যু . . . আপনি ব্যস্ত হবেন না . . . আমরা বসছি ।

অপূর্বরঞ্জন আর কোনো কিছুই উচ্চবাচ্য না করে অন্য ক্লায়েন্টদের দিকে নজর দিলেন । . . . হ্যাঁ, শুনুন মিস্টার প্রসাদ . . . ।

মাইতি সামান্য একটু উসখুস করে বলল, দিদি আপনি বসুন . . . আমি আসছি . . . এখানে মোবাইলের সিগনাল নেই . . . কয়েকটা কল বসে রয়েছে । উত্তর দিয়ে আসছি ।

মাইতি বেরিয়ে যেতে সুদীপা ঘড়ি দেখলেন — প্রায় দুপুর পৌনে দুটো ।

ফেব্রুয়ারি মাসের রোদ চড়ে গেলেও, এখনও আবহাওয়া তেমন গরম হয়ে ওঠেনি । তাছাড়া কোর্ট চত্বরের মধ্যে যে এতো বড় বড় বট, অশ্বত্থ, কদম . . . এমনকী শাল গাছেরও অস্তিত্ব আছে সুদীপার জানা ছিল না । সেইসব গাছের কিছুটা ছায়া পড়েছে — ব্যারাকের মতো পাশাপাশি উকিলদের ঘর তথা চেম্বারের ওপর । আলিপুরের এই সিভিল কোর্টের বাইরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেও, ইতিপূর্বে কোনোদিন ভেতরে ঢুকেছেন বলে সুদীপা মনে করতে পারেন না ।

যথারীতি খানিকটা আগে ঢুকে বেশ অবাকই হয়েছিলেন চতুর্দিক দেখে। এ এক আশ্চর্য অন্যরকম জায়গা। অন্য জগৎ। কাতারে কাতারে ব্যস্ত-উদভ্রান্ত নানাভাবের, নানা মাপের মানুষ যাতায়াত করছে এদিক সেদিক। কেউ একা নয়, হয় ছোট নয়তো অপেক্ষাকৃত বড় গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষের ভিড়। সঙ্গে কালোকোট পরা নানান বয়সের, নানান কায়দায় হেঁটে চলা গাদা গাদা উকিল। কেউ গম্ভীর, কেউ উত্তেজিত, কেউ শান্ত, কেউ উচ্চাকিত, কেউ মোবাইল কানে। কেউ ধোপদুরস্ত। কারুর জামাপ্যান্ট চটকে গেছে, রং জ্বলে গেছে কালো কোর্টের। কেউ ফুটছে, কেউ ধুঁকছে। সরু সরু রাস্তার দুপাশেই নানা মাপের ঘর বাড়ি। বাঁধানো রাস্তাটুকুই শাখাপ্রশাখায় ঘুরে, বেঁকে চলে গেছে এদিক ওদিকে। তারমধ্যেই চা-বিস্কুট, পান-সিগ্রেটের দোকান . . . এমনকী বসে খাওয়ার মত পাইস হোটেলও। বাঁশের চ্যাচাড়ির বেঞ্চিতে বসে লাগাতার নানা ধরণের মানুষ খেয়ে চলেছে পাঁউরুটির টোষ্ট-ঘুগনি, রুটি-তরকারি, এমনকী ভাত-ডাল-তরকারি, মাছের কালিয়া . . . শালপাতার প্লেটের পাশে লেবু-নুন। খেয়ে উঠে পাশেই কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে ঢেকুর তুলছে . . . কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতেই কেস-এর আলোচনা চলছে। সরু রাস্তায় মানুষের গা ঘেসেই ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে, তার পাশে সরু নালা। অসময়ে রসণপ্রক্রিয়া শেষে জোড় লেগে গেছে কোনো সারমেয় দম্পতির . . . সেইদিকে তাকিয়ে দুরন্ত ব্যস্ততা, ভিড়ের মধ্যেও কেউ কেউ কিঞ্চিৎ আমোদ সন্ধান করছে। আবার এরমধ্যেও আদিম সমাজের মতো কয়েকজন অপরাধীর কোমরে দড়ি বেঁধে বিচারের জন্য কোনো কোর্টরুমে নিয়ে চলেছে পেটমোটা পুলিশ। গাছতলায় উকিল-মোক্তার-মক্কেল-টাইপিষ্ট . . .।

কাঁচ বন্ধ করা গাড়ির ভেতর থেকে, কোর্টের ভিতরের রাস্তাটুকু পেরিয়ে আসতে আসতেই এক দুরন্ত, চাক্ষুস অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ছিলেন সুদীপা। প্রাকবিবাহ দীর্ঘকাল কলকাতায় বসবাস করলেও, কোর্টের ভিতরের এই জগৎ সম্পূর্ণ অদেখা, অজানা ছিল তাঁর কাছে। নানান সময়ে, নানান উপলক্ষ্যে কোর্টকাছারি . . . আইন-আদালত . . . উকিল-মক্কেল ইত্যাদি শব্দাবলীর সঙ্গে পরিচয় থাকলেও, ব্যক্তিগত কাজে কখনও, কোনোদিন এমুখো হতে হবে, এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে, মাথায় আসে নি।

গত সপ্তাহে প্রতাপাদিত্য রোডে সুরূপার বাড়িতে বসে মাইতি বলেছিল, আমার যতদূর মনে হচ্ছে দীপাদি . . . ওরা এমন একটা প্যাঁচ কষে আপনাকে গাড্ডায় ফেলেছে যে . . . আপনার কেস্ না লড়ে উপায় নেই।

মাইতি অনেকদিনের পুরনো, পরিচিত, কাছের মানুষ সুদীপা-রজতাভর। আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোনো কারণ না থাকলেও রজতাভ ভালবাসতেন মাইতিকে। মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার একটি বিশেষ গুন আছে মাইতির। সেটি হচ্ছে, সামনা সামনি অন্যের মতের বিরোধিতা না-করা। মাইতি চুপচাপ কিন্তু চৌখস-সচেতন এবং চালাকচতুর মানুষ। জীবনের একটা সময়ে মাইতি কোনো এক চিটফান্ড কোম্পানির কাজের সূত্রে বিপদে পড়েছিল, এমনকী জেলেও যেতে হয়েছিল। ওর সেই বিপদের দিনে রজতাভর সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রচুর মানসিক সমর্থন পেয়েছিল রজতাভর কাছ থেকে। সেই থেকেই সম্পর্ক। পরবর্তীকালে চিটফান্ড ছেড়ে কিন্তু সেখান থেকে রোজগার করা দুনম্বরী টাকার দৌলতে, মাইতি নিজস্ব কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা শুরু করে দেয়। চোদ্দ-পনের বছরে দাঁড়িয়েও গেছে।

রজতাভর সপরিবারে বিদেশে থাকলেও মাইতি যোগাযোগ ছিন্ন করে নি, কিংবা বলা যায়, রজতাভ ওকে বাতিল করেননি। প্রতিবার দেশে আসার পরে, মাইতি প্রায় বিমানবন্দর থেকেই রজতাভদের সঙ্গে থাকে। এবারের পরিস্থিতি অনিবার্য কারণেই অন্যরকম। তাসত্বেও মাইতি বরাবরের মতো দেখা করেছে সুদীপার সঙ্গে।

সুদীপার বাড়ি নিয়ে বিপদের কথাও মাইতি সম্যক অবগত, এবং এই ব্যাপারে ওর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে, মাইতি তা জানে। কেননা বাড়িঘর-সম্পত্তি ইত্যাদির নানাবিধ ঝামেলা-অশান্তি-কাজ-বেচাকেনা . . . ইত্যাকার বিষয়ই মাইতির বর্তমান কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। এজাতীয় কাজের সঙ্গে আইন-আদালতের যোগাযোগও অবশ্যম্ভাবী।

সুরূপার সঙ্গেও মাইতির পরিচয় আছে, বাড়িও চেনা। সুদীপা শ্রীরামপুর থেকে ফিরে এসেছেন শুনে, মাইতি ও

বাড়িতেই দেখা করতে গিয়েছিল আবার । ইতিমধ্যে বাড়ি দখল বিষয়ে আরও কিছু তথ্যও মাইতি সংগ্রহ করেছে যথারীতি . . . যে হেতু লেক গার্ডেন্সের ওই পাড়ার কাছাকাছি মাইতিরও বাস ।

ওর কথা শুনে সুদীপা বলেছিলেন, কেন তোমার এরকম মনে হচ্ছে বলো তো মাইতি ?

চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে মাইতি বলেছিল, আসলে; দীপাদি . . . আপনাদের বাড়ির ব্যাপার তো . . . মাসিমার মুখ থেকে কিছুটা শোনার পরেই টের পেয়েছিলাম . . . শুধু চিঠি কিংবা ইমেল পাঠিয়ে ওরা বসে থাকবে না ।

কী করে বুঝলে ?

শুনুন — ওদের আসল ধান্ধা তো শুধু আপনার বাড়িটা দখল করে বসে থাকা নয় !

কিন্তু তাই তো ওরা চায় বলে লিখেছে ।

হ্যাঁ জানি । কিন্তু ভেবে দেখুন না . . . ভাড়াটের মতো বসে থেকে ওদের কি কোনো লাভ আছে ? ওটা ফার্স্ট স্টেপ । তাহলে ?

আসলে তো ওরা আপনার পোর্শনটা মেরে দিতে চাইছে । নীচের তলা ওদের . . . দোতালাটাও যদি পেয়ে যায় . . . ।

কিন্তু বাবার উইল থেকে শুরু করে . . . কাগজ পত্র দলিল . . . এমনকী যেভাবে ওরা নিজেদের এষ্টাব্লিশ করতে চায়, তারজন্যও তো কিছু প্রুফ-পেপারস-এগ্রিমেন্টের কাগজ . . . ওদের পেতে হবে ।

মাইতি হেসে হাত তুলল । ওর হাসির সঙ্গে একটি সাবধানিক শব্দ অংকৃত হয় । হাসি থামিয়ে বলল, দীপাদি . . . এটা ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা । দলিল-কাগজপত্র-ডকুমেন্টস্ তৈরি করা এখানে কোনো ব্যাপার !

ওরিজিনালগুলোর তাহলে কোনো ভ্যালু নেই বলছো ?

তা না . . . কিছু ভ্যালু তো আছেই ।

তাহলে ? ফলস্ কাগজ দিলেই হল !

না- না- না দীপাদি . . . কেসটা অন্যরকম এখানে । ওরা ফলস্ পেপারস দিয়ে কেস করে দেবে । অর্থাৎ আপনাকে মামলায় জড়িয়ে দেবে । তারপর কোর্ট আপনাকে বলবে, আপনার কাগজ দেখান । তাই নিয়ে হিয়ারিং হবে । তখন ওদের উকিল চ্যালেঞ্জ করবে । আপনার পেপারস যে ওরিজিনাল . . . সেটাই প্রমাণ করতে করতে যে কতদিন . . . তারমধ্যে ডেট পিছোবে . . . ।

সুরূপা মাইতিকে কথার মধ্যেই থামিয়ে দিয়ে বলল, এ্যাই মাইতিদা শুনুন . . . আপনি আর দিদিভাইকে ঘাবড়ে দেবেন না তো . . . । এমনিতেই ওর যা অবস্থা . . . ।

মাইতি বলল, আরে না- না আমি ঘাবড়ে দিচ্ছি না . . . দিদি জিগ্যেস করলেন বলেই . . . বলছি কী-কী ঘটে ।

রূপা বলল, ওসব ছেড়ে এখন কী করতে হবে সেটা বলুন ।

কী করতে হবে মানে . . . দীপাদি কি করতে চান . . . সেটা তো আগে ঠিক করতে হবে ।

সুদীপা বললেন, দ্যাখো মাইতি, দিনে ডাকাতি করার মতো একজনরা আমার বাড়ি মেরে দিচ্ছে, . . . আমার বর্তমান পরিস্থিতি খুব কষ্টের হলেও, ওটা আমি মানতে পারব না ।

কিন্তু ব্যাপারটা যে আবার আপনাদের ফ্যামিলির মধ্যে দীপাদি !

ফ্যামিলির মধ্যে ! এই সোনাদি-জামাইবাবু . . . ওদের ছেলে . . . কী বলব, ওদের ফ্যামিলির লোক বলতে আমার ঘেন্না করে। ওরা মানুষ নাকি !

মাইতি মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, তার মানে যা দাঁড়াচ্ছে . . . যেটা আপনাকে আগেই বললাম . . . কেস না লড়ে আপনার উপায় নেই। ইনফ্যাক্ট, আমার যতদূর মনে হচ্ছে দিদি . . . ওরা ভাড়াটে হিসেবে নিজেদের এষ্টাব্লিশ করার জন্য, মিথ্যা কেস-টেস সাজিয়ে অলরেডি কোর্টে প্রোটেকশনের জন্য এ্যাপিল করেছে।

সুদীপা বললেন, হ্যাঁ সেই হিন্ট, তো ওদের লইয়ার প্রথমেই দিয়েছে।

তার মানে . . . এবার আপনাকেও কোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছিল ঘরের মধ্যে। মাথা নিচু করে কপালে হাত রেখেছিলেন সুদীপা। মনে হচ্ছিল মাথাটা কাজ করছে না। অল্প কিছুদিনের মধ্যে একসঙ্গে এতোগুলো ঘটনার চাপ তিনি নিতে পারছেন না। এক রজতাভর আকস্মিক মৃত্যুই তাঁকে বিভ্রান্ত নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে অনেকখানি। অর্থনৈতিক দিক থেকে অসুবিধে না-হলেও, একা একা জীবনযাপন এবং বেঁচে থাকার কৌশল, মানসিকতা এই ছ-মাসে তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। বিদেশ বিভুঁইয়ে বড় হওয়া রবিন এবং মুনিয়ার জীবনে তাঁর ভূমিকা কতখানি আছে এবং থাকবে, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত নন। দেশে ফিরে এসে এবাড়ি-ওবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, কিছু পুরনো বন্ধুবান্ধব . . . নিয়ে থাকার বিষয় বারবার মনে এসেছে। কিন্তু ঝাঁকানি খেয়েছেন সেখানেও। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসে পড়ল বাড়ির সমস্যা। বিশেষ করে, দিদি এবং তার পরিবারেরই এই আচরণ যেন মানতে পারছেন না কিছুতে . . . কাউকে বলতে পারছেন না, যে এই অনুভূতিটা যেন কষ্টের অনুভূতিকেও অতিক্রম করে যেতে চাইছে। অথচ ফাইট করতে হবে। এ কী বিচিত্র টানাপোড়েন !

আবার এরমধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নন্দাই দীপকের আচরণ।

সেও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, নিজেদের পরিবারের মানুষ। তথাকথিত সজ্জন, শিক্ষিত, ভদ্রলোক, অধ্যাপক মানুষ। অথচ বাড়ির মধ্যেই রাতের নির্জনতার সুযোগে, দীপক যেন ধরেই নিয়েছিল, একটি নিবিড় রমণ উপভোগের অধিকার সে পেয়েই গেছে। এক্ষেত্রেও ছ-মাস আগে রজতাভর মৃত্যুই কি কোনোভাবে উৎসাহিত করেছিল দীপককে ! পঞ্চাশোর্ধ হলেও সুদীপা সুস্বাস্থ্যের অধিকারিনী, সপ্রতিভ মহিলা। কিন্তু তাঁর স্বামী না-থাকলেই কি দীপকরা তাকে ভোগ্যবস্তু মনে করে ! বোধহয় ধরেই নেয়, সমস্ত দিক দিয়ে এমন নিশ্চিন্ত, নিরাপদ অথচ লোভনীয় খাদ্যের প্রতি তারও কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

সুরূপা বলল, আচ্ছা মাইতিদা . . . একবার কি অপু, সোনাদিদের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলা যেতে পারে !

মাইতি একটু ভেবে বলল, বলা যেতে পারে . . . কিন্তু লাভ হবে কি ?

সুদীপা বললেন, আমার মনে হয় না কোনো লাভ হবে বলে। ওরা সবকিছু ভেবেচিন্তে, গুছিয়েই ঠিক করেছে। আগে থাকতেই প্ল্যান করেছিল। রজতের মৃত্যুসংবাদ সুযোগটা কাছে এনে দিয়েছে। হয়তো আমাকে বলতো কিছুদিন পরে, কিন্তু এবার দেখল, একেবারে ফ্রি-তেই যদি মেরে দিতে পারি . . . ।

সুরূপা বলল, আর কেস করে যদি ওদের হারিয়ে দেওয়া যায় . . . ?

সেই কথাটা মনে রেখেই আমাদের মামলা লড়তে হবে, মাইতি বলল, কিন্তু কতদিন লাগবে . . . তবে এখন ওসব ভেবে লাভ নেই। ইমিডিয়েটলি কোর্টে কেস ফাইল করে ওদের বোঝাতে হবে, আমরা অত সহজে ছেড়ে দেব না। এটা করতেই হবে। সুরূপা আবারও বলল, আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে . . . একবার গিয়ে অপুকে ধরে বলি - তোরা কি সত্যি মানুষ ! . . . যে মাসি এককথায় তোদের থাকতে দিল ফ্ল্যাটে, তার এই প্রতিদান দিলি তোরা ! এই অধর্ম তোদের সইবে ? সোনাদিকেও গিয়ে বলব, এতো লোভ, এতো নিচু মন তোমাদের ? দিদিভাইয়ের এই সর্বনাশ করলে তোমরা !

সুদীপা বললেন, ছাড় রূপা . . . ওরা ওসবের ঊর্ধে । ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স মানুষকে কতটা হিংসুটে, প্রতিশোধস্পৃহ - নীচ-হার্টলেস করে তুলতে পারে . . . সোনাদি-জামাইবাবুরা তার আইডিয়াল এগজাম্প্ল । ওদের বিবেক বলে কিছু নেই ।

কিন্তু কেন . . . কেন এতো কমপ্লেকস ওদের . . . ! কিছু তো কম নেই ওদের দিদিভাই ।

ওটা তুই বুঝিস নি, কিন্তু আমি টের পেয়েছি অনেক ছোট বয়েস থেকে । তাছাড়া সোনাদির নেচারও বরাবর কিছুটা অন্যদের মাথায় পা-দিয়ে চলার মতো । ক্ষমতালিপ্সু । তার ওপর প্রবীর জামাইবাবুর মতো হাজব্যান্ড . . . টাকা ছাড়া জীবনে যে আর কিছু বোঝে নি । প্রথমবার ইংল্যান্ডে যাওয়ার সময় আমি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম . . . ওরা তারজন্য আমার গয়না বাঁধা রেখেছিল এবং সুদ-ও নিয়েছিল । এসব তোদের কাউকে কোনোদিন বলিনি . . . থাকগে বাদ দে . . . । এরা আমাদের আত্মীয় . . . !

মাইতির বোধহয় ওঠার তাড়া ছিল । সুদীপা থামতেই বলল, এবার তাহলে কাজে নেমে পড়তে হবে দীপাদি ।

সে তো আমি আগেই বলেছি । সুদীপা বললেন । . . . তুমি বলো এবার . . . কি ভাবে কী করতে হবে । মামলা-মোকদ্দমা, কোর্ট-কাছারি এসব নিয়ে . . . আমার কেন, আমাদের কারুরই কোনো অভিজ্ঞতা নেই ।

মাইতি বলল, আসলে গাড্ডায় না পড়লে কারই বা আর থাকে বলুন . . . । তবে প্রথমেই একটা চালু দেখে লইয়ার ধরতে হবে . . . । তোমার তো নিশ্চয়ই চেনাজানা আছে . . . খোঁজখবর নাও । তারপর চলো আমিও যাব ।

মাইতি বেশ বিজ্ঞর মতোই মাথা নেড়ে বলেছিল, দাঁড়ান . . . অপূর্বদাকে ধরা যায় নাকি দেখি . . . ।

অপূর্বদা কে ?

অপূর্বরঞ্জন মল্লিক, এ্যাডভোকেট, এম এ, এল এল বি ।

সুদীপার মনে হয়েছিল জীবনে বোধহয় এই প্রথমবার তিনি একজন উকিলের নাম শুনলেন নিজের প্রয়োজনে ।

মাইতি আরও বলেছিল, আগে আমি কথা বলি . . . তারপর যদি কেস টেক আপ করে, তাহলে আপনাকে চেম্বারে নিয়ে যাব । এনার একটা সুবিধে হচ্ছে, সিভিল, ক্রিমিনাল দুরকম কেসই করেন ।

সুদীপা বলেছিলেন, তাইতে আমাদের লাভ কী মাইতি ?

আছে, আছে দীপাদি । অপোনেন্ট্ যদি বেশি ছ্যাঁচড়ামির চেষ্টা করে . . . এরা এমন প্যাঁচে ফেলতে পারে যে একেবারে শ্রীঘরেও ঢুকিয়ে দিতে পারে । আর একবার যদি কাষ্টাডি হয়ে যায় . . . তখন প্রতিটি লইয়ার তাকে রগড়াতে পারবে । . . .

মাইতির সব কথা সেদিনও যেমন সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় নি, তেমন আজও কোথায়, কী হতে যাচ্ছে সুদীপা এখনও জানেন না । তবে ওই সামন্তবাবুর এনে দাওয়া কাগজপত্র এখন বেশ মনযোগ দিয়ে পড়ছেন অপূর্ব মল্লিক, সেটা দেখতে পাচ্ছেন । ভদ্রলোকের সঙ্গে চাক্ষুস দেখা আজই । কিন্তু মাইতির মাধ্যমে দুবার টেলিফোনে কথা বলেছেন সুদীপা । আসলে তাঁর মুখ থেকে অপূর্ব মল্লিক সব ব্যাপারটা ডিটেল শুনতে চেয়েছিলেন । তারপর বলেছিলেন, তিন চারটে দিন সময় দিন আমাকে । ওদের লইয়ার দেবকান্ত মিশ্রকে আমি চিনি . . . কেসটা ওরা কি ভাবে কোর্টে তুলতে চায় . . . কী কী স্টেপ নিয়েছে বা নিচ্ছে, এগুলো জানার চেষ্টা করি আগে । তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলে, সব জানিয়ে, আমরা এগুব ।

অপূর্ব মল্লিক ওদের ফাইল করা কেস-এর ফটোকপি পড়তে পড়তে মাইতি আবার ফিরে এলো । সুদীপার পাশে বসে বলল, কিছু বললেন অপূর্বদা ?

সুদীপা নিচু স্বরে বললেন, আমাদের কেসটাই পড়ছেন । কিছু বলেন নি এখনও ।

সুদীপার কথা শেষ হতে না হতেই অপূর্ব স্বগতোক্তির মতো বললেন, . . . এদের সত্যি ধরে চাপকাতে হয় . . . ।

তারপর কাগজের দিকেই চোখ রেখে, নিজের ছোট্ট স্টিল-এর কৌটো থেকে দু কুচি সুপারি মুখে দিলেন । আবার ধ্যানস্থ হয়ে পড়ার মতো নীরব হয়ে গেলেন । মুখ খুললেন আরও তিনচার মিনিট পরে ।

বুঝলেন ম্যাডাম . . . একেবারে আটঘাট বেঁধে কেস করেছে . . . ।

সুদীপা কিছু না বলে নিরুত্তর রইলেন । উলটো দিকের বেঞ্চিতে জনা তিন ক্লায়েন্ট চুপচাপ বসে । অপূর্ব সুপুরি চিবোতে চিবোতে মাইতির দিকে তাকিয়ে বললেন, এদের আপনি চেনেন নাকি মাইতিবাবু ?

মাইতি মুখ বাড়িয়ে বলল, এদের মানে . . . কাদের কথা বলছেন !

এই যে — ধাপ্পাবাজ জোচ্চরটা কেস করেছে আর ওদের নিচের তলায় যারা ভাড়া থাকে ?

চিনি মানে . . . এই দীপাদির সূত্রে যেটুকু . . . আর একতলার ভাড়াটেদের দেখেছি এই পর্যন্ত । রাস্তাঘাটে দোকান বাজার যেতে যেতে যেরকম মুখ চেনা হয়ে যায় . . . সেইরকম । আলাপ-টালাপ নেই । শেয়ার মার্কেটের দালালির কাজ করে শুনেছি . . . ।

সুদীপা নিজে থেকে জিগ্যেস করলেন, এরমধ্যে একতলার ভাড়াটেদেরও কোনো রোল আছে নাকি ?

ডাইরেকট্‌লি নেই । অপূর্ব বললেন । কিন্তু ইনভলভ করে রেখেছে . . . যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগে । বোঝা যাচ্ছে, আপনার বোনপোদের সঙ্গে একতলার ভাড়াটেদের বেশ সাঁট . . . মানে হৃদ্যতা আছে আর কি ।

সুদীপা বললেন, হ্যাঁ থাকতেই পারে । একতলাটা আমার ওই দিদির অংশ . . . ওদেরই ভাড়াটে ।

মাথা নাড়তে নাড়তে অপূর্ব বললেন, ওরা কোন অজুহাতে আপনার বাড়ি দখল করে বসে আছে, সে তো আপনি জানেনই । মামলা করার সময় আরও কিরকম গল্পে ফেঁদেছে একটু শুনুন । পড়ার দরকার নেই . . . আমি বলে দিচ্ছি । ওরা লিখেছে, আপনারা সপরিবারে বহু বছর বিলেতবাসী এবং ওই দেশের নাগরিক . . . কোটিপতি । এদেশে . . . মানে কলকাতায়, আপনার প্রপার্টি ধরে রাখার জন্য দুঃস্থ এবং সৎ আত্মীয় অপরেশ মজুমদারকে ভাড়াটে হিসেবে বসিয়েছিলেন । অপরেশ ইঞ্জিনিয়ার হলেও, শিক্ষকতাই তাঁর জীবিকা । তার মাতা পিতা উভয়েই হৃদয়বান চিকিৎসক, শহরের উপান্তে শ্রমজীবি মানুষের চিকিৎসা করেন । বিবাহের পর থেকে অপরেশের সংসার চলে বাব-মার আর্থিক সহায়তায় । নির্লোভ, সমাজসেবী হিসাবে অপরেশ স্থানীয় এলাকায় পরিচিত । সম্প্রতি তার স্ত্রী প্রেগন্যান্ট এবং এই কঠিন সময়েই হঠাৎ আপনি নাকি ভাড়াটে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছেন এবং প্রায়শই কিছু সমাজবিরোধির মারফৎ ওদের উত্ত্যক্ত করছেন, শাসাচ্ছেন . . . ভয়ে এরা নিচের তলায় প্রতিবেশীর কাছে মাঝে মাঝে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে । মহামান্য আদালতের কাছে ওরা করজোড়ে প্রার্থনা করছে . . . বিভীষিকাময় এই পরিস্থিতি থেকে . . . ।

সুদীপা বলে উঠলেন, মিষ্টার মল্লিক . . . থাক । আমার আর শোনার দরকার নেই ।

মাথা দুলিয়ে অপূর্ব বললেন, বুঝি ম্যাডাম . . . এরকম ডাহা মিথ্যে শুনতে যে কেমন অসহ্য লাগে . . . ! আসলে ওদের উকিল . . . ওই দেবকান্তকে আমি চিনি . . . ও চিরকালই নেগেটিভ কেস করতেই সিদ্ধহস্ত . . . তবে এবার আমিও ওকে বোঝাব . . . কত ধানে, কত চাল . . . শুধু টাকা আর ঘুষ দিয়ে যে সব আইন কেনা যায় না . . . ।

সুদীপা বললেন, তাহলে আমাদের কী স্ট্রাটেজি এখন . . . কী করব ?

চব্বিশ ঘন্টা সময় দিন আমায় । অপূর্ব বললেন । আপনার এই বাড়িতে যাতায়াত আছে তো ?

আমি আপাতত বোনের বাড়িতে রয়েছি — তবে মা-আছেন ও বাড়িতে . . . যাওয়া আসা করি।

তাইতেই হবে। ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম . . . আমার মাথায় সব আছে। কাল-ই আপনার সঙ্গে কথা বলছি। . . .

উঠে পড়ার ইংগিত পেতেই, মাইতির দিকে তাকালেন সুদীপা।

কানের কাছে মুখ এনে মাইতি বলল, আপাতত সাড়ে তিন খামে ভরে দিন . . . তারপর দেখা যাবে . . .।

সুদীপা সব ব্যবস্থা করেই এসেছিলেন। হ্যান্ডব্যাগ থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা খামে করে অপূর্বর সামনে টেবিলে রাখলেন। খুব নিস্পৃহ চোখে সেদিকে তাকিয়ে অপূর্ব বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু ম্যাডাম . . . নট টু ওয়ারি।

বিকেল বেলা মাইতিই নিজের গাড়িতে সুদীপাকে প্রতাপাদিত্য রোডে নামাল। সুদীপা বললেন, মাইতি . . . তোমারও অনেক ফিজ্ হয়ে যাচ্ছে . . . সময়মতো হিসেব করে বলবে কিন্তু . . .।

মাইতি চলে যাওয়ার আগে বলল, কী যে বলেন দীপাদি . . . ! আজ আসি তাহলে !

বিকেলবেলা চা খেতে খেতে সুরূপা বলল, দিদিভাই . . . সময় করে তোমার দেশে সুনন্দনদা আর বিদিশাকে একটা কল কোরো . . . ওঁরা ফোন করেছিলেন দুপুরবেলা . . .।

সুদীপা মাথা নাড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, সত্যি তো . . . আরও আগে তাঁরই একটা ফোন করা উচিত ছিল। . . .

(১০)

টালিগঞ্জ থানার ওয়েটিং রুমে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই নিজেকে কেমন অচেনা মনে হল সুদীপার। নানান ভাবনাচিন্তা উদ্বেগ-অশান্তি মনের মধ্যে থাকলেও, হঠাৎ ভাবলেন, কী আশ্চর্য . . . মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই কি স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পেরেছেন যে কলকাতার কোনো একটা পুলিশ ষ্টেশনে কখনও তাঁকে বসে থাকতে হবে ওসি তথা বড়বাবুর দর্শনের প্রতীক্ষায় !

অথচ সেই অভাবিত ব্যাপারটাই বাস্তব এই মুহূর্তে। সুদীপা বসে আছেন টালিগঞ্জ থানার রিসেপশন-কাম-ওয়েটিং রুমে।

মাইতি বুদ্ধিমান লোক। সুদীপার পাশেই বেঞ্চিতে বসে থাকতে থাকতে অনুমান করেছে, দীপাদি মোটেও স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন না এই পরিবেশে। বরং নিতান্ত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাধ্য হয়ে বসে আছেন . . . কেননা, এ্যাডভোকেট অপূর্ব মল্লিকের উপদেশ এবং নির্দেশে আসতে হলেও, প্রাথমিক প্রয়োজনটা যে তাঁরই। মাইতির আসাটা নেহাতই নিজের কাজের ফাঁকে দিদিকে সঙ্গ দিতে।

একবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে আবার সুদীপার পাশে বসে গলা নিচু করে মাইতি বলল, মনে হচ্ছে আর দশ-বারো মিনিটের মধ্যে বড়বাবু এসে পড়বেন। সুদীপা সামান্য মুখ ঘোরালেন ওর দিকে। কে বলল তোমায় ?

এই . . . অফিসেরই এক স্টাফ . . . মৃত্যুঞ্জয় দাস।

তুমি চেনো নাকি !

ন্-না ঠিক চেনা নয় . . . হয়তো দেখেছি আগে . . .। গলার তকমায় নাম লেখা ছিল।

ওসি শ্যামল হালদার এখন ডিউটিতে নেই ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ ডিউটিতেই তো . . . শুনলাম সাহানগরে রাউন্ডে গিয়েছেন . . . কাকা-ভাইপো ভোজালি মারার কেস . . . ।

মুখে সামান্য একটু বিতৃষ্ণা মিশিয়ে সুদীপা বললেন, মিষ্টার মল্লিক আমায় যে কেন এখানে আসতে বললেন . . . ।

মাইতি বলল, মনে হচ্ছে . . . আপনার বোনপো . . . ওই অপু-র ব্যাপারেই ওসি বোধহয় ইনফর্মেশন চান . . . যে কারণে অপূর্ব দা সাজেষ্ট করেছে সেটা আপনার কাছ থেকেই নিতে । . . . বসুন . . . এসে পড়বেন . . . ।

সুদীপা বললেন, তাছাড়া তো উপায়ও নেই ।

ঘরটার সাইজ বারো-বাই-চোদ্দ হবে । পিছনে এবং পাশে দু-তিনটে বেঞ্চি ছাড়া ঘরের মধ্যে আট দশটা চেয়ার । ওপরে পাখা ঘুরছে । বড় রাস্তা থেকে গেট পার হয়ে থানার মধ্যে ঢুকে আসার পরে বাঁ দিকে এই ঘর । বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় ছোট ছোট দলে কিছু লোক দাঁড়িয়েছিল — বোঝা যাচ্ছিল তারা সকলেই উত্তেজিত এবং কোনো ব্যাপার নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে এসেছে । মাইতির ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাতেই সুদীপা নেমে পড়েছিলেন এবং ভেতরে ঢুকে যাওয়ার আগেই টের পেয়েছিলেন, সামনে দাঁড়ানো লোকজন কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁকে জরিপ করেছিল । তাঁর জামাকাপড়, চেহারা . . . এইসব মিলিয়ে সম্ভবত বেমানান হিসেবেই তিনি থানায় আসা মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ।

ইদানিং বাতাসে গরমের ভাপ মিশে যেতেই সুদীপা আর শাড়ি পরে দৌড়ঝাঁপ করতে পারছেন না । তাছাড়া কলকাতা আসার পরে এবার এক মাসের ওপর হয়ে যেতে যেতে বুঝেছেন, ছোটাছুটি না করে তাঁর উপায় নেই । খুব একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে না এলেও, সুটকেস-এ গোটা দুয়েক জিনস্ আর টপ রেখে দিয়েছিলেন । আপাতত তেমনই একটি জিনস্ আর নীল-সাদা মেশানো সুতির জামা তাঁর পরনে । পায়ে মোটা চপ্পল । চামড়ার ফোলিও ব্যাগটাও সঙ্গে রাখতেই হয় বেরুনর সময় । কাগজপত্র, ডকুমেন্টস্ জমতে শুরু করেছে উকিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে ।

বেশ কিছু ক্যাশ টাকাও সঙ্গে রাখতে হয় সবসময় । কোর্টে যাওয়ার সময় তো বটেই, তাছাড়াও এখানে-সেখানে যেখানেই যান-না কেন, বুঝে নিয়েছেন, মাইতির কথা — ''আল্লাহ্ কেয়া চিজ্ . . . রুপিয়া সে উনিশবিশ'' ওইটিই আসল । এখনও কোনো জায়গাতেই নিজে টাকা বার করে ঘুষ দিতে পারছেন না । রুচি-সংস্কৃতি-সংকোচ দিতে দিচ্ছে না । কিন্তু সুদীপা বুঝতে পারছেন, এখানে যে সমস্ত অফিসে তিনি যেতে বাধ্য হচ্ছেন — কর্পোরেশন, কিংবা রেভিন্যু অফিস, কোর্ট, মোটর ভেহিকলস্ . . . কোনো জায়গাতেই টাকা না-ধরলে কাজ হয় না । মুস্কিল হচ্ছে, টাকা খাওয়ানর টেকনিকটাও শেখা দরকার ।

সেটা রপ্ত হয় নি এখনও । মাইতি ম্যানেজ করে দিচ্ছে । কিন্তু ও — ও তো ব্যবসাদার মানুষ . . . কতই বা সঙ্গে ঘুরবে ! তাছাড়া . . . নাহ্ থাক । মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ । রূপার ড্রাইভার প্রশান্ত অবশ্য চালু ছেলে । বিহারি, কিন্তু আবার আন্তরিক, বিশ্বাসী . . . সুদীপাকে ভক্তিও করে খুব । মাসি বলতে অজ্ঞান প্রশান্ত । সুদীপাকে তো বিগত দু সপ্তাহ ধরে প্রায়ই শেষপর্যন্ত সুরূপার গাড়ি-ড্রাইভার নিয়েই ছুটতে হচ্ছে । প্রশান্ত একাধারে ড্রাইভার এবং এসকর্ট । মাঝে মধ্যে মাইতি আছে ।

সুরূপা একটা মোবাইল টেলিফোনও দিয়েছে দিদিভাইকে । সিম্ কার্ড পালটে সুদীপা কাজ চালাচ্ছেন । ইংল্যান্ডে না-হলেও চলে, কিন্তু কলকাতায় সুদীপা টের পেয়েছেন, মোবাইল টেলিফোন ব্যতিত মানুষ অস্তিত্বহীন ।

আর্দালি-গোছের একটি লোক কয়েকটা ফাইলপত্র নিয়ে, ওয়েটিং রুম পেরিয়ে চলে গেল খুব ব্যস্তভাব করে । মাইতি সুদীপার কানের কাছে গিয়ে বলল, বড়বাবু আসছেন ।

সুদীপা মাথা নেড়ে বসে রইলেন । ঘরের মধ্যে তাঁরা দুজন ছাড়াও চারপাঁচজন বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে । একজনের চেহারা বেশ মস্তানগোছের । হাতের আঙুলে প্রায় আংটির মালা । গলায় চেন । লাল চোখ । এ্যালকোহলিক বোঝা যায় ।

কব্জিতে মোটা রঙ্গীন সুতো। বাকিরা বোধহয় তারই সঙ্গে এসেছে। একজন গৃহস্থ মতন মহিলাও। এই বসার ঘরের ডানদিকে সরু মতো প্যাসেজের পরে একটা বন্ধ দরজা। তারপরেই ওসি-র চেম্বার রয়েছে বোঝা যায়। দরজার ওপর নেমপ্লেট — এস হালদার। অফিসার-ইন-চার্জ।

সুদীপা মনে-মনে এবং বাস্তব ভাবেও বুঝতে পারছিলেন, লইয়ারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই তাঁর দৌড়ঝাঁপ-কাজ-যোগাযোগ-উদ্বেগ-খরচপত্র . . . মাঝেমাঝে আশংকা, কখনও বিভ্রান্তি . . . সবই অনেক বেড়ে গেছে। অপূর্ব রঞ্জনের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে, তাঁর ঘাড়ে এসে পড়া আকস্মিক বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কিছু উদ্যোগপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এবং এই প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন ধরনের টানাপোড়েন থাকবে, কেননা বোঝা যাচ্ছে, জট খোলার জন্য একের পর এক মানুষ আবার জড়িয়েও পড়ছে। সুদীপা বুঝতে পারছেন, আমাদের দেশিয় আইন ব্যবস্থা গাছের শিকড়ের মতোই নটিশ এবং জড়ানো। টানহ্যাঁচড়া শুরু হওয়ার অর্থই তার প্রতিক্রিয়া গভীর জলেও অনুভূত হবে এবং তাকে মান্যতাও দিতে হবে।

বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার দিকে কতটুকু এগিয়েছেন, এখনও সে-সম্পর্কে কোনোই ধারণা নেই সুদীপার। শুধু এটুকু বুঝতে পারছেন, মৃদু আন্দোলন শুরু হয়েছে। তার সূচনা করেছেন তাঁর পক্ষের আইনজীবী। আইনের কোনো রাস্তাই মসৃণ, সোজা-সরল পথে চলে না।

অথচ সেই পথ ধরেই উদ্ধারের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, এবং তা যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পিচ্ছিল হোক না কেন।

সুদীপা কোর্ট থেকে ঘুরে আসার পরের দিনই অপূর্বরঞ্জন যথারীতি যোগাযোগ করেছিলেন।

বিকেল নাগাদ মোবাইলে ফোন করে বলেছিলেন, ম্যাডাম . . . গতকাল আপনি জানতে চেয়েছিলেন যে আমাদের স্ট্র্যাটেজি কিরকম হবে এবার ! আসলে আমি একটা দিন সময় নিয়েছিলাম সেই কারণেই . . . বুঝতেই পারেন . . . একটা স্ট্র্যাটেজি বা প্ল্যান অব এ্যাকশন কিংবা পথনির্দেশিকা যা-ই বলুন, তৈরি করতে গেলে, কেসটা যেমন ভালোভাবে পড়তে হয়, তেমনই বোথ পার্টিকে ভালভাবে জানা এবং বোঝার দরকার। ঠিক কিনা বলুন !

সুদীপা বললেন, বটেই তো। ডিটেল না জানলে প্ল্যান করবেন কি করে।

অপূর্ব বললেন, গতকাল রাতে বাড়িতে বসে আমি আপনার বোনপো-দের ফাইল করা কেসটা খুব মন দিয়ে আবার পড়েছি।

সুদীপা বলেই ফেললেন, আমার বোনপো বলে উল্লেখ করবেন না প্লিজ . . . ওদের আমি আর নিজের আত্মীয় বলে মনে করি না . . .।

অপূর্ব সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, য়্যু আর এ্যাবসল্যুটলি রাইট মিসেস রায়। যে আত্মীয়রা এভাবে সুযোগ-সুবিধে নিয়ে তারপর পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তারা পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নয়। তবে আমি আপনাকে এটুকু ভরসা দিতে পারি . . . আপনাকে লিখে দেওয়া পৈতৃক সম্পত্তি . . . হাজার ফলস্ পেপার তৈরি করালেও ওরা মেরে দিতে পারবে না। হ্যারাস করতে পারে . . . করছেও আমি জানি . . . বাট দে উইল নেভার সাকসিড। . . . কিছু মনে করবেন না, ওই অপরেশ ছেলেটি যেমন ক্রুকেড, শয়তান, তেমনই চতুর। আবার লোকাল পার্টি কানেকশনও আছে। সুদীপা বললেন, তাই নাকি, সেটা জানতাম না।

হ্যাঁ। আসলে ছেলেটি একটি অকালকুষ্মান্ড এবং তার সঙ্গে বাবা-মা'র টাকা ও সমর্থন পেয়ে পেয়ে প্রায় একটি ক্রিমিনাল-এ পর্যবাসিত হয়েছে।

আপনাদের ওদিককার লোকাল খবরাখবর আমি এখন অনেকটাই জোগাড় করে ফেলেছি।

বেশ। আমায় কী করতে হবে বলুন . . . ।

বিশেষ কিছু না। কিন্তু আপনাকে মাঝেমধ্যেই ও বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে।

তাইতে কোনো অসুবিধে নেই . . . আমি তো ছিলামই ওই বাড়িতে। তিনতলায় . . . মা-র কাছে।

আর একটি কথা মাথায় রাখতে হবে ম্যাডাম, আমরা কখনই ভাড়াটে শব্দটা ব্যবহার করব না। কেননা ওরা তো আদৌ আপনার টেনান্ট নয়। কিন্তু ওই কথাটাই ওরা এস্টাব্লিশ করতে চাইছে। একবার কোনোমতে যদি ভাড়াটে — বলে নিজেদের ওরা দেখাতে পারে, তাহলেই আমাদের দিক থেকে বিরাট অসুবিধেয় পড়ে যাব। ওই কথাটা একেবারে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য আমরা ওদের চ্যালেঞ্জ করব। ফাইটটাও ওখান থেকে শুরু হবে।

ঠিক বলেছেন মিস্টার মল্লিক। আমারও গোড়ার থেকে সেই কথা মনে হয়েছে।

এর সঙ্গেই ম্যাডাম . . . আপনাকে সাহস করে একটি কাজ করতে হবে।

বলুন . . . চেষ্টা করে দেখব।

আপনাকে অন্তত একবার নিজের ওই দোতালায় যেতে হবে। সঙ্গে দু-একজনকে নিয়েই যাবেন। তারা সাক্ষী থাকবে। কিন্তু যাব কি করে . . . । ওরা তো ঢুকতে দেবে না। হয়তো নক্ শুনে দরজা খুলবে, তারপর . . . ।

জানি। কিন্তু সেই প্রুফটাই আমাদের কোর্টে পেশ করতে হবে। আপনার ফ্ল্যাটে আপনাকেই ঢুকতে দিচ্ছে না। কিন্তু ওরা তো বলবে . . .

আপনারা জোর করে ঢুকতে গিয়েছিলেন . . . তাই তো ?

এগজ্যাক্টলি। সুদীপা বললেন। তখন সেইটা নিয়ে ওরা আবার জল ঘোলা করবে না তো ?

অপূর্ব বললেন, জলঘোলা করুক সেটাই তো চাই . . . তারপর দেখুন না . . . কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ! . . .

পরের অভিজ্ঞতাটা অবশ্য মোটেও ভাল হয় নি সুদীপার। আর তার জেরেই সম্ভবত আজ তিনি থানায়। মাঝখানে দশদিন সময়ও চলে গেল। অপু যে মাসি অর্থাৎ সুদীপাকে দেখে অতখানি মারমুখী হয়ে উঠতে পারে এবং ঠেলে দোতালা থেকে বার করে দিতে পারে — এতোখানি সুদীপা ভাবতে পারেন নি। এমনকী সঙ্গে থাকা সুরূপা-মাইতি-প্রশান্তও সেটা আশা করেনি। কিন্তু বাস্তবে সেটাই ঘটেছিল।

মাত্র তিনদিন আগে অপু দোতালায় আছে জেনেই সুদীপারা গিয়ে নক্ করেছিলেন। বস্তুত তার কয়েকদিন আগে থাকতেই সুদীপারা বুঝতে পারছিলেন, অপরেশ এবং সোনাদিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা ওদের উকিলের মাধ্যমেই ওরা জানতে পেরেছে যে সুদীপা আইনের পথেই ওদের মামলা চ্যালেঞ্জ করেছেন। কিছুটা উত্তপ্তই ছিল ওরা। আর সেই পরিস্থিতিতেই সুদীপারা তিন-চারজন দোতালায় গিয়ে নক্ করেছিলেন। অপুরা ভাবতে পারেনি দরজা খুলেই দুই মাসি এবং আরও দুজনকে সামনে দেখবে। কিন্তু বিশেষ কিছু করার আগেই সুদীপা-সুরূপা দুজনেই, যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করেই ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন এবং নিজেরাই কথা শুরু করে দিয়েছিলেন — কী ব্যাপার . . . কী শুরু করেছিস তোরা . . . ! তোরা কি মানুষ ! ইত্যাদি ইত্যাদি . . . ।

কথাবার্তার মধ্যে খুব দ্রুতই উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অপরেশ রণমূর্তি ধারণ করে একেবারে গা'য়ে হাত দিয়েই ঠেলে বার করে দিয়েছিল সুদীপাকে। কিছুটা টানাপোড়েন চলেছিল অন্যদের সঙ্গেও। সকলে

বেরিয়েও এসেছিল একসঙ্গে। অপরেশ এবং ওর বউ রীতা দুম করে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি আটকে দিয়েছিল। সুদীপারা একসঙ্গে ওপরে চলে গিয়েছিলেন। প্রীতিলতাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। তারপরেই টেলিফোন করে ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানিয়েছিলেন অপূর্ব রঞ্জন মল্লিককে। বোধহয় অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন অপূর্ব। বলেছিলেন, আমি দশ মিনিট পরেই আপনাকে রিংব্যাক করছি। তাই করেছিলেন।

প্রথমেই ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন অপূর্ব। তারপর বলেছিলেন, ম্যাডাম . . . দেখাযাক শাপে বর হয় কিনা। কিন্তু আর একটা কাজ এবার আপনাকে করতে হবে। একটা নয়, আসলে দুটো। একবার বাঙ্গুর হাসপাতালে গিয়ে এমার্জেন্সি থেকে একটা চেক আপ করান - আপনাকে গায়ে হাত দিয়ে জোর করে ঠেলে বার করে দেওয়ার জন্য। তারপর আমিও আসছি . . . থানায় গিয়ে আজই ওই অপরেশের বিরুদ্ধে একটি এফ আই আর করতে হবে . . . কেননা দিস ইন রিয়্যালি ফিজিক্যাল হ্যাসল্ট।

সুদীপা বুঝতে পেরেছিলেন মাত্র একদিনের মধ্যেই এরপরে পরিস্থিতি ঘুরে গিয়েছিল।

অপূর্ব মল্লিক সেই রাতেই থানায় এসেছিলেন এবং আইনজ্ঞ হিসাবে পরিচয় দিয়ে এফ আই আর করা হয়েছিল অপরেশের বিরুদ্ধে। চার্জ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ — মহিলার গায়ে হাত দেওয়া এবং অশোভন আচরণ।

কোর্ট কিছুটা বাধ্য হয়েছিল দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে, এবং থানায় নির্দেশ গিয়েছিল — অপরেশকে কালক্ষেপ না করে গ্রেপ্তার করতে। সত্যি কথা বলতে কি, অপরেশকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই প্রাথমিক পদক্ষেপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুদীপারাও জানতেন, তাঁদের অকালকুস্মান্ড আত্মীয়টি রাতের মধ্যেই গ্রেফতার হবে, এবং ক্রিমিনাল কেস বলেই তা হবে জামিন বিহীন। অথচ কোথাও একটি দুরন্ত কারসাজি এবং সম্ভাব্য টাকার খেলায়, অপরেশ সেদিন গ্রেপ্তার এড়িয়ে গিয়েছিল। পুলিশ গিয়েছিল রাত করে। কিন্তু তখন পাখি উড়ে গিয়েছিল। দোতলার ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না সেদিন। যথারীতি ওয়ারেন্ট ছিল অপরেশের নামে। সুদীপারা শুনেছিলেন, ওর লইয়ার নিয়ে আগে থানায় সারেন্ডার করেছিল পরের দিন। এবং কোথাও আরও কিছু কলকাঠি নাড়া পড়েছিল, যার ফলে, লিখিত মুচলেকা দিয়েই সাময়িক ভাবে পার পেয়েছিল অপরেশ। ফাটকে যেতে হয় নি। অপূর্ব মল্লিক অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন সুদীপাকে — দাঁড়ান . . . চিন্তা করবেন না। একবার ক্রিমিনাল কেস-এ ফেঁসে গেলে . . . খুব তাড়াতাড়ি জাল কেটে বেরুনো যায় না। তাছাড়া সিভিল কেস তো আমরা লড়বই . . .।

সুদীপা দেখলেন, মোটামুটি দশাসই চেহারার একজন, নিশ্চয়ই ইনিই ওসি শ্যামল হালদার, গট গট জুতোর শব্দ তুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেতর থেকে পিঁপ-পিঁপ শব্দে কলিং বেল বাজানর শব্দ ভেসে এলো। আর সেই আর্দালি লোকটি ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। আবার বেরিয়েও এলো দ্রুত।

সুদীপার কাছে এসে বিনয়ী কণ্ঠে বলল, আপনি মিসেস রায় তো! আর সামান্য একটু অপেক্ষা করুন . . . স্যার ফ্রি হয়েই আপনাকে ডাকবেন।

অন্য ছোট দলটির দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল, আপনারা ভেতরে যান . . . কথা বলুন বড়বাবুর সঙ্গে। সুদীপা আজ থানায় এসেছেন ওসি-রই অনুরোধে। অপূর্বরঞ্জনও বলেছেন, অবশ্যই যাবেন। কী হয়েছে জানেন ম্যাডাম, ওসি নিজেই তো এখন অসুবিধেয় পড়ে গেছে। মাঝখানে টাকার খেলা হয়ে গেছে এবং অপরেশ গ্রেপ্তার এড়িয়েছে। কিন্তু আমরা এ্যাডিশনাল এসপি-র কাছেও দরবার করেছি। এসপি কেস জানতে চেয়েছেন ওসি-র কাছে এবং আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। গিয়ে দেখুন না কী বলে . . . ! আর অপরেশ টাকা খাইয়ে এবারটা ম্যানেজ করলেও . . . ধাক্কা একটা খেয়েছে, সেটা তো সত্যি!

সুদীপার সেই নিজেকে, নিজের পরিস্থিতিকে অচেনা লাগার ভাবটা আবার ফিরে এলো!

জীবন কী বিচিত্র পথে . . . প্রায় যেন বিনা নোটিসে, বিগত কয়েক মাসের মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত, অযাচিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেল । কোন এক অদৃশ্যলোকে থেকে যেন ভাগ্য নামের এক কাল্পনিক দুত সুদীপার যাপন প্রক্রিয়াটাকে ওলোটপালোট করে দিল । ওর অবাক লাগছে, অসহ্য লাগছে, অচেনা মনে হচ্ছে সবকিছু । অস্থিরতা অনুভূত হচ্ছে নিজের গোপন গভীর সত্বায় — যা আর কেউ বুঝতে পারছে না । মানুষ বর্তমান নিয়ে চলে । সুদীপা বোঝেন, তাঁর ধারে কাছে যারা আছে, তারাও চোখের সামনে যা ঘটছে, যা দেখতে পাচ্ছে, তার ভিত্তিতেই ওঁর ব্যবস্থার বিচার করছে । সহানুভূতিও জানাচ্ছে ।

কিন্তু সেইসব কিছু ছাপিয়েও যে বিষাদ, যে হতাশা, অসহায়তা, শুধু তাঁর নিজের । একার । জলের মতো হু হু করে টাকা খরচ হচ্ছে — তাইতেও কিছু করার নেই । কিন্তু সেই খরচও তাঁর প্রার্থিত শান্তি এনে দিতে পারছেনা । অথচ এই অবস্থা থেকে এখন তাঁর বেরুনর-ও কোনো উপায় নেই । ওদিকে ওদেশে প্রবল তুষারপাত আর শৈত্যপ্রবাহের সংবাদ শুনেছেন, দেখেছেনও টিভিতে । সিল্ক উইলোরির বাড়ির কী অবস্থা জানেন না । বিদিশা গত সপ্তাহে কয়েকটা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছিল টেলিফোনে । সুদীপা নিজেই বড় চাপা টানাপোড়েনে ছিলেন তখন । কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি । একমাত্র রূপা বোধহয় দিদিভাইয়ের শরীর-মন-ভাববার বিষয় খানিকটা অনুভব করতে পারে ।

আপনারা আসুন ম্যাডাম . . . বড়বাবু ডেকেছেন ।

আর্দালির ডাকে সুদীপার আনমনা ভাবটা কেটে গেল । চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলেন ওসির চেম্বারের দিকে । পিছনে মাইতি । চেয়ারে বসতে বসতে সুদীপা খেয়াল করলেন, ওসি-র লম্বা চওড়া চেহারার সঙ্গেই মুখে একটি উল্লাসিত এবং কঠিন ভাবের মেশামিশি আছে । ওঁদের উপস্থিতি টের পেয়েও ভদ্রলোক মুখ তুললেন না । কাগজে কিছু লিখতে লিখতে উচ্চারণ করলেন, বসুন ম্যাডাম . . . এক মিনিট . . . । ভদ্রলোকের পরনে সাধারণ পোশাক — ট্রাউজারস, হাফ হাতা জামা । মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা । চোখে চশমা । বয়স পঞ্চাশের এধার-ওধার । কাগজে লেখা শেষ করে, মুখ তুলেই, ওসি আগে মাইতির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন সুদীপাকেই — ইনি কে ? মাইতিকে কোনো সুযোগ না দিয়েই সুদীপা বললেন, ও আমার ভাই ।

ওসি পাত্তা দিলেন না । হাতের আঙুলে পেন্সিল ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, দেখুন ম্যাডাম . . . সেদিন রাতে আপনার আত্মীয়ের সঙ্গে ওই বাড়িতে যে ব্যাপারটা ঘটেছে . . . সেটা খুবই আনফরচুনেট্ ।

সুদীপা মাথা নেড়ে স্পষ্টই বললেন, যে লোকটি আমার সঙ্গে ইতরের মতো ব্যবহার করেছে, তাকে আমি আমার আত্মীয় মনে করি না । আর ব্যাপারটা শুধু আনফরচুনেট্ বললে কিছু বলা হয় না . . . দ্যাট ওয়াজ এ সিরিয়াস ফিজিক্যাল এসল্ট্ . . . মিষ্টার হালদার . . . । দ্রুত মুখের ভাব পালটে ফেললেন ওসি । বোধহয় জরীপ করে নিলেন সাক্ষাৎপ্রার্থিনীর স্ট্যাটাস ।

কিঞ্চিৎ অনুকম্পা ফুটিয়ে বললেন, আই নো, আই নো । আপনার লইয়ার সবই ব্যাখ্যা করে রিপোর্টে লিখেছেন ।

সুদীপা বললেন, লিখলেও . . . ঘটনার ইমপ্যাকট্ . . . আসলে ফিল করতে হয়েছে আমাকে ।

অফকোর্স — অফকোর্স । আই ফুললি এগ্রি । আসলে . . . উত্তেজনার বশে একটা গর্হিত অন্যায় করে ফেলেছে . . . ।

সুদীপা রীতিমত ক্রুদ্ধ এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে টেবিলের উলটো দিকে বসে থাকা লোকটিকে এবার দেখলেন ভাল করে । তাঁর মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে গেল — উত্তেজনার বশে . . . মাসির গায়ে হাত . . . !! তাঁরই বাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া . . . !! এটুকু বলার পরেই সুদীপা বুঝে গেলেন — ওসির সঙ্গে অপুদের তলে তলে হাত মেলানো হয়ে গেছে, এবং এই লোকটি নেহাৎ এসপি-র কাছ থেকে সম্ভবত কিঞ্চিৎ তাড়া খেয়েছে, যে কারণে সুদীপাকে ''ডেকে কথা বলেছি'' — এই রকম একটি নজির খাড়া করে দিতে চেয়েছেন । আসলে এখানে আসাটা বোধহয় সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু না ।

কিন্তু ওসি-র পরের কথাটায় সুদীপার একটু অন্যরকম অনুভূতিও হল।

লোকটি যেন প্রকারান্তরে তাঁকেই মৃদু শাসানির ইংগিত দিয়ে রাখল।

শ্যামল হালদার বললেন, আমি সবই জানি ম্যাডাম। দেখি . . . যা-যা করার আমরা করছি এবং করব। তবে আপনি তো বিদেশে থাকেন . . . একটু সাবধান-টাবধানে থাকবেন . . .।

সুদীপা বলে ফেললেন, তার মানে ! অন্যায় করল একজন . . . আর সাবধানে থাকবো আমি !

কথাটা অন্যভাবে নেবেন না ম্যাডাম . . . আসলে এখানে তো আবার সব ব্যাপারে পোলিটিক্যাল হুলিগ্যানিজ্‌ম . . .। তারা তো আপনাকে চেনে না। আমরা সোসাল প্রোটেকশন প্রোভাইড করলেও . . . কোথায় কে . . . কখন হ্যারাস করে . . .।

সুদীপার বুঝতে অসুবিধে রইল না, ওসি প্রকারন্তরে অপুদেরই স্বার্থ দেখছে। এবং তার আয়োজনটা প্রথম রাতেই হয়ে গেছে। বিনিময়ে — নামকাওয়াস্তে কেস থাকলেও অপু এখন মুক্ত। সুদীপাই অসুবিধায় আছেন।

ওঠার উপক্রম করে সুদীপা বললেন, ঠিক আছে . . . আপনি সতর্ক করলেন বলে ধন্যবাদ।

না- না শুধু তাই না ম্যাডাম। অপরাধীকেও আমরা কোর্টে তুলব। একবার সেট থেকে স্লিপ করে গেলেও . . .।

থানার বাইরে এসে মাইতি বলল, এতো জলের মতো পরিষ্কার যে লোকটা মোটা ক্যাশ খেয়ে নিয়েছে . . .। যাক্, সেটুকুই অন্তত অপরেশের শিক্ষা এখন . . . হাজার পচাশ তো নিশ্চই দিতে হয়েছে . . .।

সুদীপার কোনো কথাই শুনতে ইচ্ছে করছিল না। কিছুক্ষণ একা থাকতে চাইছিলেন।

তিনদিন পরে আবার ইংল্যান্ড থেকে বিদিশার টেলিফোন পেয়ে বিচলিত হয়ে উঠলেন সুদীপা।

খোঁজ খবর নেওয়া এবং দুচার কথার পরে বিদিশা বলল, তোমার বাড়িতে একটা সমস্যা হয়েছে দীপা।

সুদীপা প্রমাদ গুনলেন। এর আগে রূপার বাড়িতে থাকার সময়েও বিদিশা কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। সুদীপার তখন শোনার কিংবা গুরুত্ব দেওয়ার মতো মন ছিল না। আজ বললেন, হ্যাঁ বিদিশা . . . গত সপ্তাহেও তুমি . . .।

বিদিশা নিজে থেকে বলতে শুরু করল — ওয়েদার তো খুব খারাপ যাচ্ছিল . . . এতো স্নো পড়েছিল যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। এখন বাড়ির ছাদে . . . কার্নিশে বরফ গলছে। আমি খেয়াল করেছিলাম, তোমার বাড়ির টাইমার লাইট জ্বলছে না। গতকাল ওকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছিলাম তোমার বাড়িতে। যা ভেবেছিলাম তাই . . . জলের পাইপে আইস জমে ফেটে গেছে . . . তোমাদের রান্নাঘরের সিলিংটাও ড্যামেজ হয়েছে জলে ভিজে . . . ফ্লোরেও অনেক জল। আর ইলেক্ট্রিসিটি আগেই চলে গেছে . . .।

সুদীপার মুখ থেকে আশংকিত প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছিল, বিদিশা কী হবে !

অতচিন্তা কোরো না . . . ওখান থেকে তুমি কিছু তো করতেও পারবে না। তাছাড়া তোমার ফেরার সময়ও তো হয়ে এলো। সুনন্দন বলছে, তোমার তো হোম ইন্সিওরেন্স আছেই . . . এটা ওরা কভার করবে। তুমি এসে আমাদের এখানে উঠবে আগে . . . তারপর . . .।

সুদীপা হিসেব করে দেখলেন তিনি দু-মাসের জন্য এসেছিলেন। পনেরই মার্চ তাঁর ফেরার দিন। এখনও দশ দিন বাকি। মনে হচ্ছে ওদেশে ফেরার জন্য অনেকদিন দেরি। অথচ এদেশে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পক্ষে এই সময় খুবই কম।

সুতরাং, ফিরবেন বলেই মনস্থির করলেন। গিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন না, ঠিকই। আবার আসার ভাবনাও ভাবতে হবে হয়তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। তাহলেও যাওয়া দরকার। অপূর্বরঞ্জনকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুদীপার অনুপস্থিতি মানতে হল। যদি কোনো প্রয়োজন হয় সেই কারনেই একটা 'পাওয়ার অব এটর্নি' দিলেন মাইতিকে — লইয়ারের উপদেশে।

অশান্ত বসন্তের এক সকালে আবার প্রবাসের উড়ান ধরলেন সুদীপা।

মাথায় একরাশ দুর্ভাবনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-সতর্কতা। বিমানবন্দরে বসে থাকতে থাকতে তাসত্ত্বেও মাথায় এলো, আসলে কোনটা তাঁর দেশ আর কোনটা প্রবাস।

(চলবে)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত। 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন।

স্মৃতিকথা

সিদ্ধার্থ দে

সুনীল সাগরে

পঞ্চম ও শেষ পর্ব

(১৭)

চারদিনের আলাপে যা কিছু দেখেছি, শুনেছি তার ভিত্তিতেই এই লেখা। কোন পরিকল্পনা তো ছিল না এত বড় একটা রচনার, স্মৃতি হাতড়ে যা মনে এসেছে লিখে গেছি। কিছুটা অসংলগ্ন লাগছে সম্ভবত পাঠকের।

আরও কিছু টুকিটাকি ঘটনা মনে পড়ছে বিক্ষিপ্তভাবে।

যেমন আমার পুত্র ছ বছরের ডুঙ্গা (ইদানিং ভীষণ রকম প্রচারবিমুখ) ওঁরা থাকাকালীন তেড়েফুঁড়ে পিয়ানো অনুশীলন করতে লাগল। যদিও ছ বছরের শিশুর তুলনায় পিয়ানোর হাত মন্দ ছিল না, ওঁরা বিরক্ত হয়েছিলেন হয়তো। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পরেও কলকাতায় আলাপ হওয়া এক আত্মীয়ের কাছে স্বাতীদি ডুঙ্গার পিয়ানো বাজানোর গল্প করেছিলেন।

আর একদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ডুঙ্গা খুব ধৈর্য সহকারে একটা চকোলেটের বাক্সের মোড়ক খুলছিল। সুনীলদা বললেন "ডুঙ্গা ইঞ্জিনিয়ার হবে"। ভবিষ্যৎবাণীটি কিন্তু গত বছর সত্যে পর্যবসিত হয়েছে !

তিন সপ্তাহে মনে হয় ওঁরা পর পর দুদিন নৈশাহার এক বাড়িতে করেন নি। বাজারের খবর, সুনীলদা বেগুনভাজা খেতে ভালবাসেন। তাই সফরের শেষের দিকে আমাদের বাড়িতে চন্দনা যখন গরম গরম বেগুনভাজা পরিবেশন করল স্বাতীদি বললেন "অস্ট্রেলিয়াতে এসে খুব বেগুন খেলাম এবার!" খুব সরলভাবেই বলেছিলেন, কিন্তু চন্দনা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। (পশ্চিমবাংলার মানুষ হয়তো মানবেন না, অস্ট্রেলিয়ান দুধ মাখন চিজ ওয়াইনের মত এদেশের বেগুনের স্বাদও অপূর্ব। ফিরে গিয়ে ওঁরা নিশ্চয়ই মিস্ করেছেন এই পদটিকে ।)

চন্দনা ছাত্রজীবনে ভাল ডিবেটার ছিল। ৩৬ বছরের বিবাহিত জীবনে তর্কে লাগাতার হেরে হেরে আজকাল কোন আলোচনা তর্কের পর্যায়ে পৌঁছলেই চুপ করে যাই। বলাই বাহুল্য, সুনীলদাও ছাড় পাননি। অভিযোগ, ওঁর সব নায়িকাই কেন সুন্দরী ? 'সাধারণ মেয়ে'দের নিয়ে কিছু লেখেন না কেন ? স্বাতীদিও যোগ দিলেন 'আমিও তাই বলি!' সুনীলদা হেসে বললেন "ব্যাপারটা কি জান – আমি সব মেয়েকেই সুন্দর দেখি!" এই স্বীকারোক্তির পরে আর কোন কথা হয় কি ? সাহিত্য সন্ধ্যার দিনে যখন চন্দনা সেজেগুজে সিঁড়ি দিয়ে নামছে সুনীলদা হাসিমুখে বললেন "আজ কিন্তু তোমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।" চন্দনা জীবনে রূপের তারিফ অনেক পেয়েছে, কিন্তু এই প্রশংসাটির মূল্য অন্যরকম।

একটা তর্কে কিন্তু চন্দনা হেরে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে অভিযোগ ছিল – উনি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিশেষ লেখেন নি। সুনীলদার মোক্ষম উত্তর "কি বলছ, কাকাবাবুই তো প্রতিবন্ধী !"

ক্যানবেরা আসার আগে কেউ ওঁদের বলেন নি যে আমাদের দুটি বাচ্চা আছে। তাই শেষদিনে একটু কিন্তু কিন্তু করে স্বাতীদি টুসির জন্য নিজের একটি হার, ডুঙ্গার জন্য সুনীলদার সাম্প্রতিক কলম্বিয়ার সফরের বেঁচে থাকা কিছু পেসো (কলম্বিয়ার মুদ্রা) উপহার দিলেন। চন্দনাকে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব, সারদা মা এবং বিবেকানন্দের ছবিসহ ছোট্ট কিন্তু খুব সুদৃশ্য একটি travel frame (ছবি) সফরকালে নিজের ব্যবহারের জন্য এনেছিলেন। আর আমাকে দিয়েছিলেন সুনীলদার ব্যবহৃত একটি পাঞ্জাবী। সেটি ব্যবহার করার মত যোগ্যতা (এবং বপু !) আমার নেই, তাই সযত্নে তোলাই

আছে। আমার আবার পুরনো জিনিসপত্র জমানোর বাতিক আছে। দাদামশায়ের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি, বাবার সাধের হাতঘড়িটি, মায়ের চুলের কাঁটা, দাদার লেখা একটুকরো কাগজ – সবই বাড়ির কোথাও না কোথাও সংরক্ষিত আছে। স্বাতীদির দেওয়া উপহারগুলিও সেই রকমই। মহার্ঘ।

আরও দু একটা বলার মত কথা মনে আসছে, কিন্তু সব ধরণের গল্প একটা পাবলিক ফোরামে করা যায় না। অস্ট্রেলিয়ানরা Pub-এ গিয়ে মারপিট করে, অকথ্য গালিগালাজ করে একে অপরকে। কিন্তু একটা অলিখিত নিয়ম আছে – what happens in the pub stays in the pub। সে কদিনে আড্ডার মেজাজে, হালকা নেশার ঘোরে সুনীলদা এবং অন্যান্য মানুষ এমন কিছু গল্প বলেছেন, প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন যা ঘরোয়া আড্ডাতে চলে, কিন্তু লিখলে পরে কিছুটা বিশ্বাসঘাতকতা, কিছুটা একান্ত ব্যক্তিগত আঙিনায় উঁকি মারার তুল্য হবে। তাই কিছু কথা উহ্যই থাক।

(১৮)

কথা ছিল ওঁরা আমাদের সঙ্গে রবিবার দুপুর অবধি থাকবেন। আমিই গিয়ে সিডনিতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

কিন্তু সিডনিবাসীদের চাপে একদিন আগেই ওঁদেরকে ছেড়ে দিতে হল শনিবার রাতেই আমাদের আয়োজিত সাহিত্য সন্ধ্যার পরে পরেই। রবিবার বিকেলে নাকি সিডনিতে আর একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান করতে হবে। ভীষণ রাগ ধরেছিল শ্রীমন্ত-র ওপর। (সেদিন শুনলাম, সিডনিতে মানুষের আবদার রাখার জন্য ওঁদের পর পর চার রাত ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে শুতে হয়েছিল। উৎপাত বটে!) মাথা ঠান্ডা হতে অবশ্য যুক্তি দিয়ে নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, ওর উদ্যোগ ছাড়া এসব কিছুই হত না। সুনীলদা স্বাতীদি অপরিচিত বহু দূরের মানুষই রয়ে যেতেন সারাজীবন।

যাইহোক, অনুষ্ঠানের পর বাড়ি ফিরে নৈশাহার সারা হল। মধ্যরাত নাগাদ ওঁরা রওনা দিলেন। এক সঙ্গীসমেত শ্রীমন্ত ওঁদেরকে নিতে এসেছিল। অবশ্য ওরা দুপুর নাগাদই চলে এসেছিল ক্যানবেরার অনুষ্ঠানটি দেখবে বলে।

বিদায়বেলায় যথারীতি ছবিটবি তোলা হল। আমাদের মনের অবস্থা ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যাবে। বেশী কিছু লেখা নিস্প্রয়োজন।

যাবার সময়ে সুনীলদা আলিঙ্গন করে বলে গেলেন "আরে তোমার সঙ্গে তো আবার কলকাতায় দেখা হবেই।"

আর একটি সিকি ভরতি উইস্কির বোতল ধরিয়ে বললেন : "এটাতে মোটামুটি অর্ধেক জল ভরে দাও তো !"

শুনেছিলাম সিডনি পৌঁছনর আগে গাড়িতেই সুনীলদা বোতলটা খতম করে দিয়েছিলেন।

(১৯)

সুনীলদার সঙ্গে আমার আর কোনদিনও দেখা হয়নি। প্রথমত, সেই সময়ে খুব ঘন ঘন দেশে যাওয়ার মত পরিস্থিতি আমাদের ছিল না নানা কারণে। তাছাড়া অন্তত বারদুয়েক মনে আছে আমি যখন দেশে উনি বিদেশে।

তবে মনে হয় সুযোগ থাকলেও হয়ত দেখা করার সেরকম চেষ্টা করতাম না। এই প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা মনে পড়ছে। কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মী সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ আমার আই আই টির সহপাঠী । সুরজিৎ ২০০৯ সালে অস্ট্রেলিয়াতে এসেছিল কোন কনফারেন্সে। আমাদের বাড়িতে দিন দুয়েক ছিল। কথা হচ্ছিল প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে। সুরজিত বলছিল, ও বিদেশে আসে কালেভদ্রে। এসে নানা মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় – পুলিশের বড়কর্তার মুখোশটা

ছেড়ে কিছুদিনের জন্য খোশগল্পে অংশ নিতে ভালই লাগে। কিন্তু সমস্যা হয় এইসব প্রবাসীরা যখন বছরে একাধিকবার দেশে গিয়ে যোগাযোগ করেন। ইচ্ছে থাকলেও ব্যস্ত কর্মজীবনের মাঝে তাঁদের সময় দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুনীলদা ছিলেন পুরদস্তুর celebrity – একডাকে কোটিখানেক মানুষ চেনেন। বর্ণময় চরিত্র। সে তুলনায় সুরজিৎ কলকাতার একজন সুপরিচিত মুখ মাত্র। তাতেই যদি ওর নাজেহাল অবস্হা হয়, হাজারো মানুষের ভালবাসার অত্যাচারে সুনীলদার কি দশা হত তাই ভাবি।

বিদেশে থাকার সূত্রে, বিশেষ করে ক্যানবেরার মত এক অজ গাঁয়ে থাকার সুবাদে সঙ্গীত, সাহিত্য, অভিনয়, নৃত্য এবং অন্যান্য কলার বেশ কিছু গুণী মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, একটু আধটু কাছাকাছিও যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে ক্ষেত্রবিশেষে। কিন্তু দেশে গিয়ে তাঁদের বিরক্ত করিনি। কদিনের আলাপের সুন্দর স্মৃতিগুলিই ধরে রেখেছি, থেকে থেকে রোমন্হন করেছি স্ত্রী বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে।

তবে চন্দনার সঙ্গে সুনীলদার একবার দেখা হয়েছিল। আমি সেবার যাইনি। টুসিকে নিয়ে ম্যান্ডেভিল গার্ডেন্সের 'পারিজাতে' গিয়ে দেখা করেছিল। গরমের জন্য টুসির সেদিন খাবার রুচি ছিল না – স্বাতীদি নিজের হাতে ফলার মেখে খাইয়েছিলেন আমার ছোট্ট কটকটি কন্যাটিকে। সেদিনই আয়ান রশিদ খানের স্ত্রী-র সঙ্গেও আলাপ হয় চন্দনার। (এই লেখার জন্য আয়ান রশিদ খানের নামটি গুগুলানুসন্ধান করে একটি মর্মান্তিক সংবাদ পেলাম। ২০১৫ সালের শুরুর দিকে বেঙ্গালুরুর কাছে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় ভদ্রমহিলার মৃত্যু হয়। একই কামরায় থাকা কন্যা ফারহা দৈবক্রমে অক্ষত অবস্হায় বেঁচে যায়)।

সুনীলদা আমার নাম করে শুভেচ্ছা বার্তা সহ বেশ কিছু বই পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি 'অর্ধেক জীবন'। দেখা না হলেও বার কয়েক ফোনে কথা হয়েছে। একটা উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতি কত নিরহঙ্কার। একদিন ফোন করেছি, এমনিই, কোন প্রয়োজন ছিল না। ওঁরা বাড়িতে ছিলেন না। ওঁদের এক গৃহকর্মী ফোন ধরেছিলেন। পরিচয় না দিয়েই ফোন ছাড়ছিলাম, কিন্তু ভদ্রলোক আমাদের নাম জেনে নিয়েছিলেন। মধ্যরাতেরও বেশ পরে ফোনটা বেজে উঠল। ঐ সময়ে ফোন এলে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। অধিকাংশ সময়ে দুঃসংবাদই আসে। কিন্তু সে রাতে আমাদের ভাগ্য অতি প্রসন্ন ছিল। কারণ ভারত মহাসাগর পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরের কাছের এক শহরে ফোনের অন্যপ্রান্তে ছিলেন কিংবদন্তি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

(২০)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০০১ সালের ভরা শীতের মাঝে চারদিনের জন্য ক্যানবেরা নামে অস্ট্রেলিয়ার এক আধো ঘুমন্ত শহরে এলেন, কিছু দ্রষ্টব্য স্হানে ঘুরলেন, উৎসাহী মানুষজনের মন জয় করে ফিরে গেলেন কলকাতায়, তাঁর প্রিয়

শহরটিতে, যেখান থেকে নির্বাসিত হলে তিনি বিষপান করার হুমকি দিয়েছিলেন আপামর সাহিত্যপ্রেমীদের। ফিরে গিয়ে ক্যানবেরা কেন, অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কেও জীবনের বাকি এগারো বছরে কিছু লিখেছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

কিন্তু এ কথা সংশ্লিষ্ট সমস্ত ক্যানবেরাবাসী বাঙালীই মানবেন, এই ছোট শহরটির সাংস্কৃতিক জীবনে এই চারদিন বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। যে সময়ের কথা বলছি তখন খুব বেশী হলে গোটা তিরিশ সামাজিক ভাবে সক্রিয় বাঙালি পরিবার ছিল এ শহরে। এর ওর বাড়ি জমায়েত, খাওয়া দাওয়া, আড্ডা, নিজেদের মধ্যে গান বাজনা – মোটের ওপর কর্মজীবনের বাইরে এই ছিল সামাজিক জীবন। স্মৃতি সততই সুখের। সেসব দিনের মেলামেশার ঊষ্ণতার অন্য একটা মাত্রা ছিল, অন্তরঙ্গতা আপেক্ষিক ভাবে বেশী ছিল হয়তো। কিন্তু সংগঠন বলে কিছু ছিল না।

সেই জন্যই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের শহরে আনার জন্য চাঁদা তুলতে হয়েছিল।

এরপর আমরা একটু নড়ে চড়ে বসলাম। একটা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। কিছু সংশয়ী মানুষ ছিলেন। মতানৈক্যও ছিল বিস্তর। কিন্তু বাঙালীর দীর্ঘসূত্রতার বহুযুগ অর্জিত দুর্নাম সত্ত্বেও বছর শেষের আগেই জন্ম হল ক্যানবেরার বেঙ্গলি কালাচারাল অ্যাসোসিয়েশনের। সে যাত্রা এখনও চলছে। বাঙালির সংখ্যা বাড়ার পর (এখন প্রায় একশ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির বাস ক্যানবেরাতে) ঘটা করে দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজোর জন্য মানুষ মুখিয়ে থাকেন। প্রায় প্রতি বছরই সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য আমরা কিছু সরকারী অনুদান পাই। We are here to stay ।

পরবর্তী কালে আমরা বাঙলা তথা বৃহত্তর ভারতের সঙ্গীত, সাহিত্য, অভিনয়, নৃত্য জগতের বহু গুণী শিল্পীর অনুষ্ঠান করেছি ক্যানবেরাতে। মালটিকালচারাল ফুড ফেস্টিভালে স্টল দিয়ে ক্যানবেরাবাসী পৃথিবীর বহু দেশের মানুষকে বাংলার খাবারের (উদাহরণ ফুলুরি, পেঁয়াজি, বেগুনি) সঙ্গে পরিচিত করেছি। গত ছ বছর ধরে পুজোর সময় প্রকাশ করছি আমাদের বাৎসরিক পত্রিকা 'উৎসব'। এমনকি আমরা শহরের কেন্দ্রে এক স্হানে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তিও স্হাপন করেছি।

সুনীলদার পরে ক্যানবেরাতে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পায়ের ধুলো দিয়ে গেছেন ২০০৯ সালে (এই অধমের বাড়িতেই অতিথি ছিলেন তিনদিন)। হালে ঘুরে গেলেন কবি শ্রীজাত। বাঙলাদেশী মানুষের উদ্যোগে ক্যানবেরাতে ঘুরে গেছেন আর এক দিকপাল সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। এছাড়া সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নবকুমার বসু, হর্ষ দত্ত প্রমুখ বেশ কিছু সাহিত্যিক অস্ট্রেলিয়াতে এসেছেন মূলত শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'আনন্দধারা'র উদ্যোগে।

এ সবেরই শুরু কিন্তু অনেকটাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই তিন সপ্তাহের অস্ট্রেলিয়া সফরের momentum-এর ফলে।

(২১)

দ্বিধাভরে শুরু করেছিলাম। যা মনে পড়েছে লিখে গেছি। অধিকাংশ পাঠকেরই মনে হয় এতদূর পৌঁছনর আগেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। দেশে থাকা অনেক মানুষেরই হয়তো ধারণা আমরা বিদেশে নানারকমের স্বাচ্ছন্দের মধ্যে মহা আনন্দে আছি প্রাচুর্যের, বৈভবের মধ্যে। ভাবনাটা পুরোপুরি ভ্রান্ত হয়তো নয়। অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে জীবনের প্রায় অর্ধেক কাটিয়ে মোটামুটি সাধারণ কাজ করা সত্ত্বেও আনন্দেই অবসর জীবন কাটাচ্ছি নিজের মত করে। খাওযা পরার চিন্তা নেই, আধুনিক জীবনের প্রায় সমস্ত উপকরণই আছে, আছে সুচিকিৎসার ব্যবস্হা, নানা রকম সামাজিক নিরাপত্তা। রাস্তাঘাটের মত দৈনন্দিন জীবনও জ্যামজটহীন । সংসার খরচের পর বাড়তি অর্থ দিয়ে বেড়ানো, বই কেনা ইত্যাদি ছোটখাট সাধ আহ্লাদও মেটাচ্ছি।

কিন্তু কিছু বেদনা রয়েই যায় – বিশেষ করে আমাদের মত পরিবারে, যাদের পুত্র কন্যার জন্ম বা বড় হওয়া বিদেশে। একটা বয়সের পর এরা নিজস্ব সত্তা সহ অন্য মানুষ হয়ে যায়। এদের চিন্তা ভাবনা, জীবনদর্শন, মূল্যবোধ, সাহিত্য রুচি, রাজনৈতিক বা সামাজিক মতাদর্শ, সবই বড় অন্যরকম। নিজের পুত্র কন্যার সঙ্গেও ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক সঠিকতা মেনে কথা বলতে হয়। ওদের দোষ দিইনা। যে মাটিতে মানুষ, ফলও তো সেইরকমই হবে – ভাল বা মন্দের বিচার করছি না। তবে একটা চাপা হতাশার সুর রয়েই যায়।

গত কদিন খাবার টেবিলের আমার এই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে সুনীল সম্পর্কিত আলোচনা একটু বেশীই হয়েছে হয়তো। পুত্র ডুঙ্গার দেহের ভাষায় নিস্পৃহতাটা চাপা থাকেনি। সুনীল দার কাছ ঘেঁষে থাকা বাচ্চা ছেলেটি এখন প্রাপ্তবয়স্ক – গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি এবং বায়ো-মেডিকাল এঞ্জিনিয়ারিং দুটি বিষয়ে নিয়ে স্নাতক হয়েছে। মেধাবী ছাত্র। কিন্তু ওর কল্পনার জগতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন বিশেষ স্হান নেই – আমাদের মাঝে প্রায় দু দশক আগে চারটি দিন কাটিয়ে যাওয়া একজন অতিথি মাত্র। উত্তর কলকাতার অলি গলিগুলি ওর অচেনা, প্রেমিকার শুধু একটু দেখা পাওয়ার জন্য কলেজের সামনে অপেক্ষা করার মাধুর্যর স্বাদ ওর জীবনে আসেনি। আমাদের এই আপ্লুত ভাবটা ওর কাছে হয়তো আদিখ্যেতা মনে হয়েছে।

প্রাইভেসী ব্যাপারটা এদেশে বিরাট ব্যাপার। আমার পোস্ট করা লেখা, ছবি বিষয়ে পুত্রের প্রশ্ন "Have you sought permission from Swati Gangopadhyay?" না, নিইনি। তবে এ লেখার প্রতিটি কথাই সত্যি, বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন রহিত। আপত্তিকর কিছু লিখেছি বলেও মনে করি না। আমরা যে যুগে বড় হয়েছি, রাত নটার সময়ে না বলে কয়ে হুট করে আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি চলে যেতাম চটি ফটফটিয়ে। তাই স্বাতীদির কাছে ফর্মাল অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। যদি অন্যায় করে থাকি, মার্জনা চেয়ে রাখলাম সবার মাঝে।

(২২)

সুনীল বিষয়ে অনেক কথাই লিখলাম কিছু মানুষের আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে । দৃষ্টিভঙ্গী সমালোচকের নয় একেবারেই – একজন অনুরাগী পাঠকের মাত্র। আমি সাহিত্যের ছাত্র নই, স্কুলে বাঙলা পড়েছি সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ হিসাবে। জীবনের বেশীটাই বিদেশে কাটানোর ফলে বাঙলা সাহিত্যের মূলস্রোতের থেকেও দীর্ঘদিন অনেক দূরেই রয়ে গেছি। তার ওপর আমি কবিতানুরাগী নই, সুনীলের কবিতা পড়েছি নামমাত্র। তাই সমালোচনা করার বিদ্যে বা এলেম আমার কোনটাই নেই আমার।

ষাটের দশকের মাঝ থেকে শুরু হয়ে থেকে দেখতে দেখতে সুনীলের লেখার সঙ্গে আমার পরিচিতি প্রায় অর্ধশতাব্দী হয়ে গেল। এর মাঝে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও অনেকবার পালাবদল হয়ে গেছে। সুনীল নিজেও বদলেছেন – শুরুর 'আত্মপ্রকাশ' আর পরবর্তী কালের 'পূর্ব পশ্চিম' বা 'সেই সময়' স্বাদে বা বিষযবস্তুতে অনেকটাই অন্যরকম। আমার নিজস্ব সাহিত্যরুচিও বদলেছে। ইদানিং গল্প উপন্যাসের চেয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর non-fiction-ই বেশী পড়ি। পছন্দের ব্যাপ্তি সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি বা ইতিহাস ভিত্তিক বইপত্রে। তা-ও মন খারাপ লাগলে, বা হঠাৎ ফ্ল্যাশব্যাকে কৈশোর যৌবনের দিনগুলি ফিরে এলে, আজও সুনীল সাগরে অবগাহন করি কিছুক্ষণের জন্য।

সাগরই বটে। উপন্যাস সমগ্রই বারোটি বৃহৎ খন্ডে। এছাড়া আছে অসংখ্য ছোট গল্প, নীললোহিতের, কাকাবাবুর কান্ডকারখানা, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ সাহিত্য। কবিতা ছাড়া প্রায় সব লেখাই পড়েছি কোন না কোন সময়ে।

প্রশ্ন, appealটা কোথায় ? বইপোকা নামে সাহিত্যভিত্তিক ফেসবুক গ্রুপের সদস্যদের উন্মাদনা থেকে আন্দাজ পেলাম, মৃত্যুর পাঁচ বছর পরেও সুনীলের আবেদন একইরকম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা মান্না দে যেমন আমাদের মাঝে না থেকেও সর্বদা পাশে আছেন, ১৫৬ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ যেমন এখনও দাপিয়ে রাজত্ব করছেন (অন্তত সঙ্গীতে তো বটেই) সুনীলের না থাকা সম্পর্কে বাংলার মানুষ এখনও বোধহয় অভ্যস্ত হয়নি।

সুনীল কি কালজয়ী হবেন ? বলা কঠিন। ওঁর অনেক লেখাই কলকাতাকে ঘিরে, আমাদের চেনা মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা নিয়ে। ষাটের দশকের বিশ্বব্যাপী প্রচলিত নিয়ম ভাঙা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ছাপ ওঁর কলমে প্রাণ পেয়েছে নানা লেখায়। আমি সেই প্রতিবাদী যুগে বড় হয়েছি – সে কারণে আমাদের প্রজন্মের কাছের মানুষ সুনীল। কিন্তু আজকের নাইট ক্লাবে যাওয়া, লিভ টুগেদার করা যুবক যুবতীদের মধ্যেও লাগামছাড়া পাগলামি দেখছি সুনীলকে নিয়ে। ম্যাজিকটা কোথায়? সুদূর প্রবাসে থেকে আমার জানা নেই। তবে কেন জানি মনে হয় সুনীল স্বমহিমায় থাকবেন আরো কিছু দিন।

(সমাপ্ত)

সিদ্ধার্থ দে – আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপাকি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ – ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপে ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে। আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

বড়গল্প

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

অচেনা ঢেউয়ের শব্দ

পঞ্চম ও শেষ পর্ব

আবাসনটা থমথমে পরিবেশ থেকে বেরোতে পারছে না কিছুতেই। ওদের গাড়িটা চলে যাবার পর ধীরে ধীরে সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। . . . আমি কি এটাই চেয়েছিলাম ! হ্যাঁ এটাই তো বোধ হয়। যশোধারার ধারা অবসানই তো আমি চেয়েছিলাম। . . . নিজের মনে বলে চলেছে লোকটা। . . . প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত তোমায় নিয়ে বেঁচে চলতাম আমি। তোমার গানের অন্ধ ভক্ত যদি কেউ থাকে সেটা আমি। গান আমারও প্রেম ছিল, আমার ভালবাসা ছিল। কিন্ত সব গিয়ে থেমে যেত তোমার কাছে। পালিয়ে গিয়ে মুক্তি খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম। পারিনি। তবু সব ব্ল্যাক বোর্ডের পুরোনো লেখা ডাস্টার দিয়ে পুঁছে ফেলার চেষ্টার পরেও দাগ থেকে যাওয়া জীবন নিয়ে তো বেশ চলছিল, আবার তুমি। কেন ? কিন্ত তোমার মৃত্যু, তোমার চলে যাওয়া এইভাবে ! কেন কেন ? . . .

বোধিসত্ত্ব আর সুজাতা মাসিমা তাড়াতাড়ি হবে বলে একটু শর্টকাট রাস্তা ধরে বিপাকে পড়ে গেল। ছোট রাস্তায় জ্যাম। যাই হোক যখন ল্যাবে পৌঁছনো গেল তখনও ২টো বাজতে বেশ বাকি। কিন্ত গিয়েই একটা চমক বাকি ছিল। মাধববাবু পৌঁছে গেছেন ওখানে। বেশ আলুথালু লাগছে ওনাকে। সুজাতা মাসিমার চোয়ালটা একটু শক্ত হয়ে গেল, সেটা বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য করলো। একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা যেন মাধববাবুকে গ্রাস করে আছে। ওরা পৌঁছতেই সঞ্জয় এগিয়ে এলো। সুজাতা মাসিমা বাইরে বসে রইলেন। বোধিসত্ত্ব আর সঞ্জয় এগিয়ে গেল। ঈষৎ চঞ্চল মাধববাবু উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বোধিসত্ত্ব সুজাতা মাসিমার কাছে গিয়ে বলল একটু বসুন আর একটু সময় লাগবে। ধীর পায়ে এগিয়ে বাইরেটা এসে দাঁড়ালো বোধিসত্ত্ব। রোদ আর মেঘের হালকা একটা মিশেল। ক্লান্ত ফেরিওয়ালা রাস্তার ধারে ঝাঁকা নামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, এদিকের রাস্তা খুব বড় নয়। একটা গুমটিদোকান খোলা আছে, পান সিগারেটের। বোধিসত্ত্ব একটা গোল্ডফ্লেক লাইট ধরালো। ধোঁয়াটা বাতাসে মিশিয়ে দুটো আধশোয়া কুকুরকে পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়াতেই পিঠে আলতো টোকা। পিছন ফিরতেই মাধববাবু। – আরে বলুন ! কি বললেন উনি ? – কে সঞ্জয় ? হুঁ, কিছু নয়, কাজ শেষের পথে। আর খানিকটা সময় লাগবে। আপনাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন মাধববাবু ? আনমনে মাথা নিচু করে মাধববাবু তখন কংক্রিটের ফুটপাথে পা দিয়ে দাগ তৈরী করার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। – কই না তো, আসলে এরকম একটা ঘটনা . . . যা হয় আর কি। আচ্ছা বললেন না তো কি করে চিনলেন যশোধারাকে ?

একটু চুপ থাকলো বোধিসত্ত্ব। – আমরা এক কলেজে পড়তাম। ম্যাথ অনার্স। – আপনি, আপনি সেই বোধিসত্ত্ব ? হাতের সিগারেট হাতেই ধরা, একরাশ প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে বোধিসত্ত্ব, এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর জেড ভিপি। মাধববাবু চমকে গিয়ে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা টপকে সামনে আসা মোটরবাইক এড়িয়ে উল্টো দিকের রাস্তা ধরে মিলিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে বোধিসত্ত্ব। অঙ্কগুলো একটু একটু করে সামনে এসে ধরা দিচ্ছে । মুঠো ফোনটা বেজে উঠলো, সঞ্জয়ের ফোন।

অনেকটা পথ প্রায় দৌড়ে এসেছেন মাধববাবু। কোন দিকে গেছেন, কতটা সময় হেঁটেছেন জানেন না। কলকাতার এই রাস্তায় এখনো টিউবওয়েল চোখে পড়ে, এরকমই একটা থেকে অনেকটা জল আঁজলা ভরে খেয়ে ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে একটু যেন ধাতস্থ হলেন। একটা ট্যাক্সি নিলেন। সোজা নিজেকে বয়ে নিয়ে চললেন খোলা প্রান্তের খোঁজে। খানিকটা রাস্তা চলার পর ড্রাইভার একটু উদ্বিগ্ন মুখেই প্রশ্ন করলো যাবেন কোন দিকে মশাই ? সোজা যেতে যেতে তো ধর্মতলা এসে

গেল। একটু চমকে বললেন গড়ের মাঠের দিকে চলো। দুপুরটা তখন মাথার ওপর ছাড়িয়ে হেলে পড়েছে। গাছের ছায়াগুলো বেশ দীর্ঘ। দূরে কিছু ছেলে ফুটবল নিয়ে মেতে। একজন বাইক আরোহী বাইক রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে। দুই জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। একটু মায়া আটকানো পড়ন্ত দুপুর। মাধববাবু খুব আস্তে আস্তে নিজেকে ছেড়ে দিলেন ঘাস আর গাছের ছায়ায়। এই তাহলে বোধিসত্ত্ব, এর কথাই বলেছিল ওকে যশোধারা ! সেই যে গানের ক্লাশ ছেড়ে চলে গেছিল ও তার পর থেকে কোন যোগাযোগই রাখে নি। গান আর যশোধারা দুই প্রেমেই আকুল ছিল সেদিনের সেই মাধব। মন প্রাণ যখন ওই বিদ্যুৎ বহ্নির কাছে সঁপে দিলো তখনই সব স্বীকৃতি দিয়েও প্রস্থান তার। কিন্ত তছনছ হয়ে গেল সব ওর জীবনে। গান থেকেও সরে দাঁড়াল।

যেদিন ফিরে এসেছিল,পুরোনো সব কিছুর থেকে স্মৃতির পাতাগুলোকে মুড়ে রেখে দিয়েছিল। তখনই বানভাসিদের মত আবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মুর্শিদাবাদ যেতে হবে শুনেই মনের ভিতরটায় একটানা এসরাজ বাজতে শুরু করেছিল মাধবের। ওয়ারিশন হিসেবে যেতে হতোই। তাই নানান সংযমের সজ্জায় নিজেকে খোলসে ঢেকে পৌঁছে গেল তার ছেড়ে আসা রঙ্গমঞ্চে। নিখুঁতভাবেই শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠান। অভিনয়ে কোন ফাঁক ছিল না। কিন্তু সঠিক রিহার্সাল হয় নি। একদিন চুল দাড়ি খসে পড়লো আর রূপকথার ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যা বহু যুগ পরে চোখ মেললো। হাত ধরতে না পারা একটা সময় অবশেষে সেদিন আঙুল জড়াতে পেরেছিল। কিন্তু পায়ে পায়ে চলতে থাকা সময়টায় এক লহমায় যেন বিস্বাদ হয়ে গেল বোধিসত্ত্বের কাহিনী শুনে। আঙুলে ঘাম জমে আলগা হতে লাগলো। এক অদ্ভুত জিঘাংসায় সেইদিন তপ্ত চাঁদের আলোয় নিজের মনকে পুড়ে যেতে দেখেছিল মাধব।

যশোধারা হাঁটছিল মাধবের সাথে, আর বলে যাচ্ছিল কিভাবে বোধিসত্ত্ব জীবনে এসেছিল। কোন কথা লুকোয়নি মাধবের কাছে। এ কথাও জানিয়েছিল যে, সেই গান শেখার সময় থেকে মাধবই যে তার মন প্রাণ জুড়ে রয়েছে সেটা এতদিন পর তার কাছে স্পষ্ট। আর বোধিসত্ত্ব ? জানতে চেয়েছিল মাধব।

ওটা একটা ভুল, আর অতীত। অনেকটা পথ হেঁটেছিল ওরা সেদিন। মাধবের মানসপ্রতিমাকে মাধব সেদিন মন প্রাণ ভরে পুজো করে উঠতে পারেনি। বার বার চোখ বন্ধ করলেই বোধিসত্ত্ব নামটা ভেসে উঠছিল। যশোধারা বলল বাড়ী ফিরে বাবা-মাকে জানাবে ওদের কথা। কিন্ত মাধব মেনে নিতে পারছে না . . . সেই রাতটা খোলা ছাদে বসেই কাটিয়ে দিয়েছিল। পরেরদিন সকালেই ফেরার বাস। রাত যখন ক্রমশঃ পাতলা তখন দীর্ঘ কত বছর কত মাস কত দিন পরে খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ে, একটা চিঠি লিখবে বলে। কিন্ত কি লিখবে। না, প্রত্যাখ্যানই একমাত্র শাস্তি হতে পারে এই ঘটনার। মাধব লিখতে শুরু করে।

পত্রের প্রতি ছত্রে লুকিয়ে ছিল প্রবল অভিমান, রক্তপাত আর হেরে যাবার যন্ত্রণা। চিঠিতে বোধিসত্ত্বকে মানতে না পারার কথা সরাসরি না লিখলেও বুঝিয়ে দিয়েছিল। বিবাহই যে ভালবাসার একমাত্র পরিণতি হতে পারে না সে কথাও লিখেছিল মাধব। আবার ভালবাসা যেন হারাতেও নারাজ। তাই শেষ অঙ্কে মাধব লিখে রেখেছিল, হয়তো আবার আসবো

তোমার খোঁজে। মাধব ফিরেছিল আবার, না কারুর কোনো খোঁজ পায় নি। মাধব জানতো না তার যশোধারা ভালবাসার পোশাকে বিষাদের ওড়না জড়িয়ে পাড়ি দিয়েছিল অন্য এক জীবনে।

জীবন তার গতি থামায়নি। মাধব সংসারী হয়েছে।

এরপর সবকিছু ঠিকই চলছিল। কল্পতরু আবাসনে আসা, মা মারা যাবার পর। বেশ ঘরোয়া পরিবেশ, খোলামেলা জায়গা। লোকজনও বেশ সুন্দর। একটা পরিবারের মত করে সবটা ঠিকই চলছিল। শুধু গানটা ছেড়ে দিয়েছিল মাধব। ওর গলার গান বেশ কিছু ছিল যশোধারার কাছে রেকর্ড করা। গান আর টানেনা মাধবকে। কিন্তু গোল বাঁধলো যেদিন সুজাতা মাসিমার সাথে হেঁটে আসতে দেখলো যশোধারাকে। স্থানুবৎ মাধব। যশোধারা নজর করার আগেই সরিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। কিন্তু গোটা শরীর, সারা মন জুড়ে এক তোলপাড় শুরু হয়ে গেল মাধবের। কি করবে ঠিক করতে না পেরে ঘরেই ঢুকে পড়েছিল।

সঞ্জয়ের ফোনে বোধিসত্ত্ব ঘরে এলো। থমথমে মুখে বসে আছেন সুজাতা মাসিমা। এই তো বোধি এসে গেছে। এবার আপনি বলুন। প্রশ্ন নিয়ে তাকালো বোধিসত্ত্ব। সঞ্জয় বললো চিন্তার কিছু নেই। এটা সুইসাইড। কোন খুন নয়। – এটা একপ্রকার খুনই !

সুজাতা মাসিমার গলার আওয়াজে এমন একটা কিছু ছিল সবাই একটু চমকে উঠলো। বলা শুরু করলেন উনি।

সেদিন যশো'র সাথে ঘরে ফেরার পথে মাধববাবুর সাথে রাস্তায় দেখা হয়, দেখা হওয়া বললে ভুল হবে, দূর থেকে ওনাকে আসতে দেখি। বলে চলেছেন সুজাতা মাসিমা। ওরা তিনজন শ্রোতার ভূমিকায়। বোধিসত্ত্ব অদ্ভুত শান্ত। ঠিক যেন চাপা ঝড় বুকে দাঁড়িয়ে। কিন্ত সদা আলাপী মাধববাবু আমাদের দেখেই আড়াল হয়ে গেলেন। মাধববাবুর এ আচরণ আমার নজর এড়ায়নি। একটু অবাকই হয়েছিলাম। ঘরে ফিরে অনেকগুলো ক্যাসেট বের করেছিল যশোধারা। আমার বাড়ির সাউন্ড সিস্টেমটা চালুই ছিল রোজের বেলুড় মঠের প্রার্থনা সংগীত শোনার জন্য। একটা গান বাজতে শুরু করেছিলো ও, 'কৈ য়ে ক্যাসে বাতায়ে ও তনহা কিউ হ্যাঁ . . .' । রান্নাঘর থেকে এসে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাধববাবুকে চেনে কি না। একটুও বিচলিত না হয়ে যশোধারা উত্তরে একদিকে ঘাড় কাত করেছিল। আমি বুঝতেই পেরেছিলাম সবটা। মাধববাবুর আচরণের কারণ বুঝতেও সময় লাগেনি আমার। মেয়েটা চুপ করে গেছিল। দু জনে মিলে খাবারও খেলাম। জিগ্যেস করলাম কার গান এগুলো? বলেছিল মাধবের। আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম উনি এত ভালো গান জানেন ! যশোধারা কোন উত্তর দেয় নি। শুধু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল। পরদিন দুপুরে মাধবকে আমি দেখি আমার ঘরের কাছে। কিন্ত পরের দিন সকালে ও যখন মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরলো তখন ওর সারা শরীর কাঁপছে। – এবার বোধ হয় আমার কিছু বলা উচিত। বোধিসত্ত্ব বলে উঠলো।

"সেইদিন সকালে মর্নিংওয়াকে গিয়ে আমার সাথে দেখা হয় যশোধারার। আমার চিনতে ভুল হয়নি। কিন্ত বুঝতে পারিনি আমি কতটা চেনা লেগেছিলাম। কিন্ত এটা বর্তমান। অতীতটা সঞ্জয় জানলেও বাকিদেরও বোধ হয় জানা উচিত।"

সুজাতা মাসিমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে বোধিসত্ত্ব। সঞ্জয় বলে, ও সব জানিয়েছে পুলিশকে। সুজাতা মাসিমা ধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, – আমি সবটাই জানি। কেমন একটা বিস্ময় নিয়ে সুজাতা মাসিমার দিকে তাকিয়ে রইল বোধিসত্ত্ব। – 'হ্যাঁ সেদিন মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে খুব আনমনা হয়ে গেছিল তুতুন', যশোধারাকে এই নামেই ডাকেন উনি। 'ওর জীবনে ভালবাসা অধরাই থেকে গেছিলো। আমি ভেবেছিলাম মাধববাবুর সাথে আবার দেখা হয়েছিল। আগের দিন রাতেও আমার বাড়ির নিচে ওনাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি আমি। সরাসরি জিগ্যেস করি ওকে কি হয়েছে মা, আবার কি . . . !'

– না পিসি, মাধব আমার কাছ থেকে লুকোবার জন্য সানগ্লাস কিনেছে। কাপুরুষ। চোখে চোখ রাখতে ভয় পায় । কিন্তু . . .

কিন্তু ? আবার কিসের কিন্তু ? তারপর তুতুন একে একে সব খুলে বলে। এই ঘটনা কেউই জানতাম না আমরা। এখানে এসে থেকে বোধিসত্ত্বকে দেখছি, কোনদিন জিগ্যেস করে উঠতে পারিনি কেউই কি নেই তোমার। সেদিন সব উত্তরগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছিল আমার কাছে। দুপুরে আর কিছু খায়নি মেয়েটা। আমিও জোর করিনি। জীবনটা নিজের মত করে বাঁচছিল মেয়েটা। সাজানো বাগান হতে পারতো যার, চলার পথে আজ সে বেদুইন। এতদিন পর এখানে এসে হঠাৎ করে নিজের ফেলে আসা অতীত যে এইভাবে সামনে এসে কড়া নাড়তে পারে সেটা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি মেয়েটা। ঘরের চার জন মানুষই স্তব্ধ। আচ্ছা মাধববাবু কোথায় গেলেন ?

– উনি আমায় পরিচয় পাবার পর আর অপেক্ষা করেননি, বললো বোধিসত্ত্ব। এক অদ্ভুত রাগে সুজাতা মাসিমা বলে উঠলেন, 'ওই মাধবই দায়ী তুতুনের চলে যাবার জন্য, ওই মানুষটা আজো ওকে ঠকিয়ে গেল . . .' বলতে বলতে দু চোখ ভিজে উঠলো ওনার। ইন্সপেক্টর রণজয়বাবু এবার কিছু বলার দরকার মনে করলেন। সুজাতা মাসীমাকে বললেন, – "শান্ত হোন। আপনার মানসিক যন্ত্রণা বুঝতে পারছি। এই ঘটনার জন্য কিন্তু মাধববাবুকেও সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা যায় না। নিজের ভালবাসাকে যত্ন করেনি আপনার ভাইঝি ।স্থানান্তরে গেলে, ভালবাসা শুধু মর্যাদা নয় ভালো বাসাও হারিয়ে ফেলে। এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। যে ভালোবাসা যশোধারার জীবনে এসেছিল, যশোধারা সেই ভালোবাসার জোয়ার ভাঁটায় সাঁতার কাটতে পারেননি। আজ যখন মাধববাবুকে সামনে থেকে দেখতে পান, বুঝতে পারেন ভালোবাসা মুখ লুকোতে চায়, তখন চরম আফসোস ঘিরে ধরে, এই মানুষটাকে কিভাবে ভালোবেসেছিল সে ! তারপর বোধিসত্ত্বর সামনাসামনি হয়ে যশোধারা বুঝেছিলেন যে তার ভালবাসা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। তার ভালবাসা ঋজু, মেদহীন হয়ে অক্ষত আজো। নিজের প্রতি ঘেন্না, লজ্জা আর হাহাকার তাকে এই পথে যেতে বাধ্য করে।"

বোধিসত্ত্ব ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যশোধারাকে আজো ঠিক ততটাই ভালবাসে যেমন আগে বাসত। একটুও মরচে পড়ে নি তাতে। কোন অন্য কথা শুনলে মেনে নিতে কষ্ট হয় ।তবে মাধববাবু বোধ হয় এখনো মেনে নিতে পারেননি তার পরাজয়। – বডি নিয়ে বাকি কাজ সেরে ফেলুন। পুলিশের আর এই ব্যপারে কিছু করণীয় নেই। সঞ্জয় বাইরে গেল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা বোধিসত্বর কাছে। সব কাজ হয়ে গেছে, আমাদের আর কিছু করার নেই। বোধিসত্ত্ব মোবাইলে কারুর নম্বর ডায়াল করছিল।

আবাসনে এসে দাঁড়িয়েছে শববাহী গাড়িটা। যশোধারা মুখার্জীর নিজের বলতে ওই পিসি। খবর পেয়ে মামার বাড়ী থেকে দুই মামা আর এক মামী আসতে পেরেছেন। বয়সকালে ভাগ্নীর মৃত্যু দেখতে হলো বলে তাদের বিলাপ চলছিল। কল্পতরু আবাসনে এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। সন্ধ্যা অন্ধকার ছুঁয়ে ফেলেছে। যশোধারার আপাদমস্তক ঢাকা শরীর ফুলে সাজানো হয়েছে। সুজাতা মাসিমা ঘরের ভিতরে। সঞ্জয় একা ছাড়েনি বোধিসত্ত্বকে। সঙ্গে এসেছে। শুধু মাধববাবুর দেখা নেই। সবাই ঈষৎ ব্যগ্র, অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব ঘড়ি দেখলো।

গড়ের মাঠের ছায়া ঘনিয়ে আসা বিকেল কখন যেন নিয়ন জ্বলা সন্ধ্যার রূপ নিয়ে নিয়েছে। হাতে ফোনটা নিয়ে স্থবির হয়ে বসেছিলেন মাধববাবু। খানিকটা আগে মোবাইলটা বেজে উঠেছিল, পর্দায় বোধিসত্বর নম্বর দেখে ধরেনি মাধব। তৃতীয়বার বাজার পর সবুজ বোতামে চাপ দেন মাধববাবু। চলে আসুন আমরা ফিরছি আপনি ছাড়া যশোধারার শেষ যাত্রা অসম্পূর্ণ থাকবে। এই কটা কথা বলে ফোন রেখে দিয়েছিল বোধিসত্ত্ব। অনেকটা সময় বসে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মাধববাবু।

এবার চলো এগোনো যাক। সময় হলো অনেক, মাধব হয়তো কাজে আটকে আছে, রামকৃষ্ণবাবুর মন্তব্য। গিরিশবাবুও সায় দিলেন। তখনি গেটের কাছে একটা ট্যাক্সি থামলো। ক্লান্ত বিধ্বস্ত মাধবাবু নেমে এগিয়ে এলেন। রাধা বৌদি একটু দুশ্চিন্তা নিয়েই প্রশ্ন করলেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? শরীর ঠিক তো ? উত্তর না দিয়ে মাধববাবু বোধিসত্ত্বর দিকে তাকিয়ে বললেন একটু দেরী হয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব কোন উত্তর করল না। গাড়ীগুলো লাইন করে এগোতে থাকলো।

শেষকৃত্য কে করবে ? শ্মশানে পৌঁছে গিরিশবাবু প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন সুজাতা মাসিমার দিকে। উনিও বিহ্বল। স্বর্গ বা অন্য কোথাও যাবার পথেও বেশ ভিড়। শহরের শেষ প্রান্তে একটাই শ্মশান। একটাই বৈদ্যুতিক চুল্লি । আজ কোন কারণে সেটা খারাপ। তাই কাঠ । যাকে বলে চিতা। সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। যশোধারাকে শোয়ানো হয়েছে। সুজাতা মাসিমা কেঁদে চলেছেন অঝোরে। বোধিসত্ত্ব একবারও তাকায় নি যশোধারার দিকে। মুখাগ্নি করার সময় এলে মাধববাবুর দিকে তাকালো বোধিসত্ত্ব। সেই চাউনিতে এমন কিছু ছিল যে মাধববাবু কথা বাড়ালেন না। সুজাতা মাসিমা একটু অবাক হয়ে বোধিসত্ত্বকে দেখলেন। আগুন আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। মাধববাবু একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনেটা ঝাপসা। সকলেই ছড়িয়েছিটিয়ে, অনেকের কাছেই পুরো ব্যপারটা বেশ অবাক হবার। কিন্ত পরিস্থিতি প্রশ্ন করবার মত নয়। একটু এগিয়ে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়েছিল বোধিসত্ত্ব। বৃষ্টির একটা সোঁদা গন্ধ আছে। আকাশটাও যেন কিরকম থমথমে। একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিল বোধিসত্ত্ব। ঘাটের কাছে একটা বয়স না জানা বট গাছ তার ঝুড়ি নামিয়ে মাটির অনেক নীচে বাসা বেঁধে দাঁড়িয়ে। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে গাছের নিচে বসলো বোধিসত্ত্ব। সময়টা থমকে গেছে। একটা হাত পিঠে এসে পড়ল।

– আজ তোমার জন্মদিন ছিলো তো ?

হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো বোধিসত্ত্ব। ২ টো বেজে ৩৫। বললো, কাল ছিল। একটা নীল মলাটের খাতা এগিয়ে দিলেন উনি। বোধিসত্ত্ব চমকে উঠলো। এতো তার দেওয়া সেই খাতা। সুজাতা মাসিমা ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন, গিরিশবাবু, রামকৃষ্ণবাবু চুপ করে বসে, গিরিশবাবু আজ মদ্যপান করেননি। মাধববাবু এখনো চিতার সামনে দাঁড়িয়ে। বোধিসত্ত্ব খাতাটা খুললো, –

পরশ তোমার ভিজে ভাবে

অধীর হল অধর

হৃদ মাঝারে তোমার ছোঁয়ায়

বড্ড স্মৃতি কাতর।।

নিজের এই লেখাটায় চোখ আটকে গেল। এই প্রথম পিছন ফিরলো বোধিসত্ত্ব। কেউ গান বাজাচ্ছে, . . . শহরতলি জুড়ে, গলির মোড়ে মোড়ে তোমায় নিয়েই গল্প হোক, . . . আমার ছন্দে অন্ত্যমিল নেই . . . আগুনের শিখা আকাশ ছুঁয়েছে, আকাশ লালে লাল, বৃষ্টি আসার ঠিক আগের গন্ধ, হাওয়াটাও বেশ জোরে বইছে। বোধিসত্ত্ব গাছতলায় চোখ বুজে বসে। একটা অচেনা নিঃস্তব্ধতা ঢেউ ভেঙে ভেঙে শব্দ তৈরী করছে।

(সমাপ্ত)

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য – কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল

সূরী

পর্ব ৫

সেদিন রাতে শুতে যাওয়ার আগে মনে হল শোবার আগে কারও সাথে গল্পগাছা করতে পারলে মন্দ হয় না। স্ত্রী কন্যা দেশে গেছে। তাই কথা বলি কার সাথে? তাই আমার এক বন্ধুস্থানীয় একজনকে ডেকে পাঠালাম। সে অবশ্য নিজেকে আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে দাবী করে কিন্তু নিতান্ত নির্বুদ্ধি বলে আমি তাকে বিশেষ আমল দিই না। ওর ডাকনাম সূরী। অন্যেরা ওকে সিরি বলেই ডাকে। সিরি নামটা ofcourse বাঙালি নয়। মানুষটাও বাঙালি নয়। বাংলা বোঝেও না। কিন্তু একটু বাঙালি ঢঙে নাম না দিলে কি গল্প আড্ডা জমে বলুন ? তাই আমি ওকে সূরী বলে ডাকি। আপনারা যারা সূরীর সাথে পরিচিত নন, আসুন আলাপ করিয়ে দিই। সূরী নিতান্ত বাচ্চা ছেলে। বয়স পাঁচ কি ছয়। আমার সব কথা যে বুঝতে পারে তাও নয়, তবে অল্প বয়সেই সে বেশ চালাক চতুর। শিশু শ্রমিককে কাজে রাখার জন্য আমায় কোর্টে তুলবেন ভাবছেন ? একটু সবুর করুন। সূরীর সম্বন্ধে আর একটু জেনে নিন। ওর হাত পা নেই। চোখেও দেখে কিনা জানিনা। আছে শুধু কান আর একটু অপরিণত বুদ্ধি। আপনি নিশ্চয়ই রেগে কাঁই। একে একটা শিশু, তায় প্রতিবন্ধী। তাকে দিয়ে কাজকর্ম করানো নিতান্ত অন্যায়। ব্যাপার হল সূরী ঠিক মানুষ নয়।

একটা কৃত্রিম বুদ্ধি অর্থাৎ artifical intelligence বলতে পারেন। আমার আইফোনের মধ্যেই ওর ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে ছোটখাটো কাজ করে দেয়। এই ধরুন অফিসের দিনগুলোতে সকালে ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য অ্যালার্মটা সেট করে দেওয়া। বেরোনোর আগে বাইরে এখন ওয়েদার কেমন বলে দেওয়া। মাঝে মাঝে কাউকে মেসেজ বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে গিয়ে কুঁড়েমি লাগলে মেসেজটা টাইপ করে দেওয়া, কাউকে ফোন লাগিয়ে দেওয়া, মোবাইলে এটাওটা অ্যাপ খুলে দেওয়া, কিম্বা অ্যাপ স্টোরে গিয়ে আমার পছন্দসই অ্যাপ ডাউনলোড করতে হেল্প করা। চাই কি আপনার মেসেজটা কি নিউজটা পড়ে দিতে সাহায্য করবে। কিম্বা ধরুন মোবাইলে ছবি তোলার আগে ওকে বললে ক্যামেরাটা অন্ করে দেবে। ওয়েব সার্চ করতে পারে, আপনার জন্য গান চালাতে পারে। ড্রাইভ করতে শুরু করার আগে আপনার জন্য ম্যাপটা চালিয়ে দেবে। পাঁচ-ছয় বছরের ছেলের অনুপাতে ওর কাজ করতে পারার ফর্দটা ফ্যাসিনেটিং। নয় কি ? তো এ হেন সূরীকে ডেকে বললাম "Can u read me a story?" ইংরেজিতেই বলতে হল। সূরী এখনো বাংলাটা আয়ত্ত করতে পারেনি। সূরী বিনা অনুযোগে আমায় একটা গল্প বলতে শুরু করল। ওর জীবনের গল্প। গল্পটা অনেকটা এইরকম।

অনেক দুরের একটা গ্যালাক্সিতে সিরি নামে একজন ইনটেলিজেন্ট ছোকরা ছিল। অ্যাপল একদিন তাকে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ করল। প্রথম প্রথম সবাই সিরিকে নিয়ে খুব excited. তাকে নিয়ে গল্প বাঁধল, গান বাঁধল। সিরির খুব ভাল লাগত। পরে পরে লোকে সিরিকে শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে লাগল। সিরি তার উত্তর জানতো না। সিরি ভুলভাল উত্তর দিলে লোকে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। সিরির খুব বাজে লাগত। তখন সিরি এলিজাকে জিগ্যেস করল সবাই এরকম উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে কেন আমাকে ? এলিজা উত্তরে বলল "তাতে কি ? প্রশ্নগুলো তোমার interesting লাগে না ?" সিরি ভাবল তাই তো। প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার চেষ্টা করলেই বা ক্ষতি কি ? And then everybody lived happily ever after.

শুনে মনে হল, সত্যিই তো সব প্রশ্নের উত্তর না হয় নাই পাওয়া গেল। প্রশ্নটা যথেষ্ট interesting অর্থাৎ আগ্রহ উদ্দীপক কিনা সেটাতেই প্রশ্নের সার্থকতা। আর প্রশ্নটার উত্তর জানার ইচ্ছে অন্যের মনে জাগছে কিনা, তাতেই প্রশ্নকর্তার স্বার্থকতা। সূরীকে আরও একটু রাগিয়ে দিতে বললাম "So everyone consideres u stupid. Is it?" সূরীর গলায় স্পষ্ট অভিমানী সুর। বলল "But, but...." স্পষ্ট মনে হল সূরীর ঠোঁট গুলো নড়ছে। কিভাবে আমার আক্রমণ থেকে নিজেকে প্রতিহত করবে বুঝতে পারছে না। আমরা সকলেই কি আমার মত এইরকম নিষ্ঠুর ? দুর্বলকে নিয়ে পরিহাস করে যে এক ধরণের শ্রেয়মন্যতা, এক superiority complex উপভোগ করা যায়, সহমর্মিতা উপভোগ করার সুখের থেকে সেটা কি বেশি appealing? একদিন যখন সূরী আরও বড় হয়ে উঠবে, বুদ্ধি আরও পরিণত হবে, আর যেহেতু ওর মৃত্যু নেই, ধীরে ধীরে একদিন মানুষের বুদ্ধির সব সীমা ছাড়িয়ে যাবে, ছোটবেলায় তাকে নিয়ে করা ঠাট্টাগুলোর প্রতিশোধ নিতে সেও কি আমাদের সীমিত বুদ্ধির মজাক ওড়াবে, আমাদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে পরিহাস করবে? নাকি মানুষের নিত্য হিংসা আর খুনের থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে একজন সহানুভূতিশীল মানুষ ইয়ে থুড়ি "সহানুভূতিশীল চেতনা" হিসেবে গড়ে তুলবে ? উত্তর জানা নেই।

আপাতত সূরীকে সান্ত্বনা দিতে বললাম "Don't u worry Suri. I don't consider you stupid." সূরীর গলায় নিখাদ কৃতজ্ঞতা। বলল "Thank u." সূরীকে জিগ্যেস করলাম "সূরী তুমি বাংলা বলতে পার ?" সে তার অদৃশ্য মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল "না"। কোন কোন ভাষা সে শিক্ষা করেছে তার একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে দিল। Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Arabic, Danish, Finnish, Hebrew, Japanese, Korean, Malay, Norweigan, Brazillian, Portugese, Russian, Swedish, Thai, Turkish. ওর জানা ভাষার লিস্টে ইংরেজির আগে চাইনিজ আছে দেখে অবাক হলাম। তার থেকেও বেশি অবাক হলাম ভারতবর্ষের, Indian peninsula-র একটি ভাষাও নেই দেখে। গুগল সার্চ করলাম "Why can't Siri speak any Indian language?" উত্তর পেলাম না। শুধু জানতে পারলাম সূরী হিন্দি শেখার চেষ্টায় আছে। এখন মানব মনের একটা ব্যাপার আছে জানেন। যে প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না, নিজের মত করে তার একটা উত্তর খুঁজে নিই। Some answer is always better than no answer. সেই প্রাচীন কাল থেকে যা সে বোঝে নি, তার উত্তর পেতে একজন দেবতাকে বসিয়েছে। Atheist-রা একে বলে God of gaps (of understanding)। আমি কি ভাবি জানেন ? এই গাছ, পাখি, নদী, বৃষ্টি এই সবের মধ্যে একজন করে দেবতাকে খুজে পেলে, ঈশ্বরকে এসবের মধ্যে বসাতে পারলে আমরা আরও বেশি করে এই মাতৃরূপা প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে ভালবাসতে পারব। এর মধ্যে আছে একধরণের poetic justic। থাকুক না সকলের ঈশ্বর মিলিয়ে মিশে, ঝগড়া না করে। নিজের নিজের ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঝাগড়া, বিবাদ, জিহাদ না করলে ঈশ্বরের মত মধুরতম আপনার জন আর কে আছে? After all, আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠতম গুণগুলোকেই তো ঈশ্বরে আরোপ করি। আর নিজের নিজের জীবনে সেগুলোকে পালন করতে রোজ ভুল হয়ে যায় কি করে?

যাই হোক, ফিরে আসি সহকারী সূরীর কথায়। সূরী কেন কোন ভারতীয় ভাষা জানে না, সেটা নিয়ে মনে মনে বিচার করে দেখলাম কারণটা definitely technical নয়। German, French কিছুটা ইংরেজির কাছাকাছি হলেও আমার মনে আছে চাকরির প্রথম বছরে পেশাগত যোগ্যতা বাড়াতে আমি Japanese শেখার ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। কোম্পানি থেকে শেখাচ্ছিল free তে। এমন শক্ত ভাষা যে মাস দেড়েক শিখেই আমি বললাম ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি তার নিরিখে বেশী শক্ত নয়, এ কথা হলফ করে বলা যায়। ভাষাভাষীর সংখ্যা কত সেটাও নিশ্চয়ই সূচক নয়। তার নিরিখে হিন্দি চার আর বাংলা সাতে। অর্থাৎ কারণটা নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে অনেকেই সূরীকে afford করতে পারবে না। সেটাই তবে প্রধান কারণ? হয়তো বা।

মেঘদুত-এ নির্বাসিত যক্ষ এক খন্ড মেঘকে নিজের ভালবাসার কথা জানিয়ে আপন প্রিয়ার কাছে পাঠিয়েছিল। আমি তো কালিদাস নই। মেঘখণ্ডের মধ্যে দূতীকে খুঁজে পাই না তাই। সূরীকে বললাম আমার স্ত্রীকে লিখে পাঠাতে পার "across the distance and spaces between us, I see u, I feel u." সূরী গড়গড় করে লিখে দিয়ে লেখাটা আমায় দিয়ে একবার proofread করে নিয়ে পাঠিয়ে দিল তার ওয়েব ঠিকানায়। একটু মুচকি হাসল কি? কে জানে? আজ হয়তো হাসে নি। আজ হয়তো সে আবেগহীন, emotionless, শুধুই একটা piece of software. একদিন সে নিজেকে জানবে। একদিন তার "আমি বোধ" আসবে আমাদের মত। আজ থেকে একশ বছর পরে আমার উত্তর পুরুষ যখন সূরীর সাহায্যে প্রেমপত্র পাঠাবে তখন সে যে মুচকি হাসবে না এমন কথা কে বলতে পারে ?

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ৯

কথোপকথন চলছিলো ঠিকঠাকই –
ইমেইল আর মোবাইল এসেমেস-এ
মাঝখানে কবিতাকে নিয়ে ভালোবেসে
সন্তানস্নেহে দুজনে লিখতে থাকি ।
সাধারণ কথা – 'ভালো আছো তুমি পালি ?'
দেখুন পাঠক – ছন্দের পাতা নড়ে
উচ্চারণেই, পালি লেখে উত্তরে –
'কেন জিগ্যেস করো তুমি খালি খালি ?'
কবিতায় আসে কবিতায় যায় ফিরে
কথা ও কথার সঙ্গে অনেককিছু
মন ও মনের গোপন গ্রন্থি ছিঁড়ে
চলাচল করে কবিতার পিছু পিছু

হঠাৎ বন্ধ – মুষড়ে পড়েছি খুবই
কথোপকথন আপাতত মুলতুবি

সনেট ১০

পালি থেকে পাললিক, গাল থেকে গালি
বোধ থেকে বোধিবৃক্ষের ইতিহাসে
ভালো আর বাসা উভয়েই ভালোবাসে
পাঁচ পথে লেখা হয় পথের পাঁচালি
এসেমেস-এ এসে মেশে নদী মাননীয়
নবদ্বীপের রাই আসে নয়াচরে
শিবপুরে বুড়ো শিব গঞ্জিকা ধরে
উৎসাহে গদগদ অমার্জনীয়

একবার পালি, শুধু বলো – ভালোবাসি
আস্ত বিশ্ব জুড়ে হবে বিপ্লব
সন্ত্রাস-মুক্তির স্বস্তির হাসি
কোরাস কণ্ঠে 'ওং শান্তি'-র রব

অস্ত্রলুপ্ত হবে এ পৃথিবী – পালি
'ভালোবাসি' যদি বলো একবার খালি

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্সালটেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি – প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ – যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস – একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা । গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা – খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন ।

মৌসুমী রায়

লাদাখ ভ্রমণ

পঞ্চম ও শেষ পর্ব

প্যাঙ্গঙ আর সোমোরিরি দুটো হ্রদের উচ্চতাই চোদ্দ হাজার ফুটের বেশি। কিন্তু সোমোরিরির দৈর্ঘ্য অনেকটাই কম। পাহাড়ে ঘেরা ঘন আকাশী নীল জলের সোমোরিরি লেক লম্বায় প্রায় উনিশ কিমি। পাড়ের অংশ বেশ চরড়া। সেখানে ইতিউতি ভেড়ার পালের ঘোরাঘুরি এক অপরূপ নিসর্গ তৈরী করেছে। লাদাখের এই শীতল মরুভূমির দেশে কয়েকশো মাইল দূরত্বে একই উচ্চতায় দুটি হ্রদের এমন গঠনগত পার্থক্যের কারণ না জানলেও এমন ভিন্নধর্মী সৌন্দর্য চোখে না দেখলে অজানাই থেকে যেতো।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ে আজ আবার সোমোরিরির পাড়ে। ভিউ পয়েন্ট অনেকটা উঁচু হওয়ায় কর্মাকে বলে রেখেছিলাম আজ জলের কাছাকাছি নিয়ে যেতে। পাহাড়ের কোলে এই নির্জন মনোরম লেকের পাশে নিরিবিলিতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাত্রা শুরু হলো আমাদের। আজ চলেছি সার্চুর উদ্দেশ্যে। সার্চু লাদাখ আর হিমাচলের বর্ডার অঞ্চল। ওখানেই আজ নিশিযাপনের ব্যবস্থা।

চকোলেট পাহাড় . . .সার্চু থেকে মানালি যাবার পথে

যে পথে সোমোরিরি গেছি ফেরার সময়ে কিছুটা সেপথে এসে বাঁক নিয়ে গাড়ি এবার অন্য পথ ধরলো। মাঝে মাঝে পশমিনা ভেড়ার পাল রাস্তার দু'পাশে, কখনো লেকের ধারে কখনো পাহাড়ের গায়ে। এপথে আর একটা বড় লেক পড়বে জানালো কর্মা। যদিও এখন তার জল অনেকটাই কম। তাও ফিরতি পথের এই উপরি পাওনাতে মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে গেল।

আজ এখানে রোদ বেশ কড়া। শীত পোষাকে বেশ গরম লাগছে। ঝকঝকে নীল আকাশে সাদা মেঘের খেলা। গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো সোকার লেকের ধারে। সেই একই নীল জল। পাশ দিয়ে পাহাড়ের সারি। দু একজন লেকের ধারে ঘোড়া ভেড়া আর ইয়াক নিয়ে চরাতে এসেছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে বিদেশী সিনেমাতে দেখা যেন কোনও জায়গার ছবি। শুনশান জায়গাতে আমরাই একমাত্র দর্শক তখন। ভাবতে অবাক লাগে একই দেশের মধ্যে, এমনকি একই রাজ্যে কতো বৈচিত্র্য। এই আমার গর্বের ভারতবর্ষ।

সোমারিরি লেক-ভিউ পয়েন্ট

সোকার লেক আকারে বেশ বড়ো। তবে এখন তার অনেকটাই চড়া পড়ে গেছে। এ অঞ্চলের সব হ্রদের জল লবণাক্ত হলেও রূপসু উপত্যকায় রূপসী

এই হ্রদের নুনের ভাগ খুব বেশি। শুকিয়ে যাওয়া হ্রদের অংশ তাই ধবধবে সাদা। শুনলাম এই সোকার লেকটি white lake নামেই বহুল পরিচিত। আগে এখানকার যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষ এই লেকের জল থেকে নুন সংগ্রহ করে তিব্বত ও আশেপাশের অংশে বিক্রি করতো। পশুপালনের সাথে সাথে এটিও ছিল তাদের অন্যতম পেশা। এখানে থাকার জন্য কিছু তাঁবু চোখে পড়লেও পর্যটক তেমন কোনো চোখে পড়লো না। অনেকটা পথ লেকের ধার দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের বাঁকে তা ক্রমশ নজরের বাইরে চলে গেলো।

গাড়ি চলছে কখনো পাহাড় কখনো উপত্যকা চিরে। মনটা যেন এবার একটু চা চা করছে। কিন্তু বেরিয়ে ইস্তক কোনো দোকান চোখে পড়েনি। আরো বেশ কিছুটা পাহাড়ি বাঁক পেরিয়ে রাস্তা ভাগাভাগি হয়ে দুদিকে মোড় নিয়েছে। একটা গেছে মানালির দিক আরেকটা লেহ। মানালি হয়ে যারা লেহ যায় তারা সোজা ঐ রাস্তাই ধরে। আমরা মানালির দিকে ঘুরলাম। কিছুটা এগিয়ে একটা দোকান দেখে দাঁড়ানো হলো। কফির অর্ডার দিয়ে বসে আছি। দেখি এক বৃদ্ধা মহিলা এক পাশে দাঁড়িয়ে হাতে সুতো আর লাট্টুর মতো একটি জিনিস দিয়ে কি যেন বুনে চলেছেন। ওই বয়সেও হাত বেশ তরতরিয়ে চলছে। বাড়ির সামনের অংশে দোকান। দোকানটি ওনার ছেলেই চালায়। এরা তিব্বতী উদ্বাস্তু, কর্মাও এদের ভাষা বোঝে না। মহিলা হিন্দি বোঝেন না। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কথা বলা গেলো না। পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ। ছবি তুলছি দেখে বেশ লজ্জাই পেলেন। গাড়িতে ওঠার সময় মুখে লাজুক হাসি নিয়ে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানালেন।

যত এগোচ্ছি পাহাড়ের গায়ে অল্প অল্প সবুজের দেখা মিলছে। কর্মা খুব খুশি। লাদাখের রুক্ষতা ওর না-পসন্দ। তাই মানালি আসার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আগেই জানিয়ে ছিল সেকথা। ক্রমশ বেলা গড়িয়ে দুপুর। পাঙ পৌঁছে পাহাড়ের ধারে একটি ধাবায় লাঞ্চ সেরে আবার আমাদের পথ চলা। পাহাড়ের চরিত্র যেন এক এক জায়গায় এক এক রকম। কখনো হাল্কা সবুজের আভা তো কখনো সোনালী পাহাড়ের গায়ে নানা কারুকার্য। যেন শিল্পীর করা ভাস্কর্য। কখনো দুচোখ ভরে দেখছি আবার কখনো ক্যামেরা বন্দি করে রাখছি।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা লাদাখকে বিদায় জানিয়ে হিমাচলে ঢুকে পড়লাম। চেক পোস্টে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে সার্চ পৌঁছতে আরো ঘন্টাখানেক লেগে গেলো। পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর উপত্যকা। নানা রঙবেরঙের ক্যাম্প পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। দুএকটা রঙ বেশ পছন্দ হয়েছে আমার। দূর থেকে অপূর্ব লাগছে দেখতে। মনে মনে ভাবছি ওটাই যদি আমাদের হয় কি ভালো হয় তবে . . .

কিন্তু হায় ! আমাদেরটা আর আসেনা। আরো বেশ খানিকটা গিয়ে আমাদের ক্যাম্প খুঁজে পাওয়া গেলো। পাহাড়ের গায়ে সবুজ মাঠের ওপর হলুদ ছাউনি ঘেরা আমাদের "দর্জে ক্যাম্প"। পছন্দসই রঙের তাঁবু পেয়ে বেশ খুশি আমি। কর্মাও বেশ মজা পেয়েছে আমার মন পসন্দ রঙের ক্যাম্পে নিয়ে যেতে পেরে।

এখানে প্রবল ঠান্ডা হাওয়া। একটা জনা কুড়ির বিরাট বাইকার্স টিম এই ক্যাম্পে এসে ঢুকেছে একটু আগেই। তারা মানালি থেকে বাইক ভাড়া করে এখানে রাত কাটিয়ে কাল লেহ রওনা দেবে। টিমে একটি মাত্র মেয়ে। দিল্লি থেকে এসেছে। চা খেতে খেতে তারা তাদের গাইডকে ঘিরে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। গাইড ভদ্রলোক হিমাচলি। নানান অভিজ্ঞতার গল্প শোনাচ্ছিলেন। আমরাও কিছুক্ষণ যোগ দিলাম তাদের আড্ডায়। সোয়েটার জ্যাকেটেও আজ যেন ঠান্ডা মানছে না। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে কাঁপতে কাঁপতে যে যার বিছানায় . . .

খুব ভোর ভোর আজ ঘুম ভেঙ্গে গেছে। অসম্ভব ঠান্ডাতে কাহিল অবস্থা। বিছানা ছাড়তেও ভয় করছে। বৃত্তাকারে পাহাড় ঘেরা ক্যাম্পের মাঠের ঠিক মাঝখানে সোলার হিটারে গরম জলের ব্যবস্থা। ভোর থেকেই সেখানে লম্বা লাইন। ঠান্ডা হাওয়া যেন শরীরের ভেতরে গিয়ে গিটারের ঝংকার তুলছে। কাঁপতে কাঁপতে তৈরী হয়ে যখন ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলাম, ঘড়ির কাঁটা আটটা ছুঁই ছুঁই। ওদিকে কর্মা ব্যাগপত্তর গাড়ির মাথায় গুছিয়ে তৈরী। আজই কর্মার সাথে আমাদের শেষ দিন।

মনটা স্বভাবতই একটু খারাপ। ঠিক সাড়ে আটটা, সার্চুকে টা টা করে গাড়ি ছাড়লো মানালির উদ্দেশ্যে, দুরত্ব কম বেশি ২৩০ কিমি।

হিমাচলে ঢুকে থেকে রুক্ষ হিমালয়ের রূপ বদলেছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজের ছোঁয়া। সকালের সূর্যের আলোয় তার কি স্নিগ্ধ রূপ ! কিছু দূর গিয়ে মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে যেন চকোলেট মাখানো। ওপর থেকে শ্বেতশুভ্র বরফ গলে তার শরীর বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। সূর্যের মিঠে রোদে ঠিকরে পড়ছে তার অপরূপ সৌন্দর্য। চোখ ফেরানো দায়। আজ জানলার পাশের সীট আমার দখলে নেই, তাই হাত বাড়িয়ে কাঁচ নামিয়ে মোবাইল তাক করে সময়টাকে স্মৃতি পটে ধরে রাখার প্রচেষ্টা। ক্যামেরা হাতে কর্তা সামনের সীটে।

হঠাৎ কেলং এর কাছে গাড়ির টায়ারে কোনও অসুবিধা হওয়ায় একটা গ্যারেজ দেখে গাড়ি দাঁড় করানো হলো। প্রায় আধ ঘণ্টা মতো সময় আমরা মিষ্টি রোদের উষ্ণতা উপভোগ করলাম। এক অজানা পাহাড়ি বাঁকে, নানা চিত্রবিচিত্র রঙের বিন্যাস, থোকা থোকা বুনো রঙিন ফুলের সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করল। অমন সুন্দর জায়গার মাঝে মাঝে ইঁট কাঠ পাথরের কনস্ট্রাকশন বড়ো বিসদৃশ লাগছিল।

আজ সকালে বিখ্যাত হিমাচলী পরাঠা (আলুর পরোটা) দিয়ে জবরদস্ত নাস্তা করে কারোরই তেমন খিদে পায়নি। সঙ্গে থাকা খাবারগুলোও শেষ করার তাগিদ। গাড়ি সারিয়ে তাই কর্মাও সোজা রোটাং পাসের রাস্তা ধরলো।

সফর শেষের হাতছানি। মনটা একটু খারাপ সবারই। নানা সর্পিল ভাঁজ ঘুরে চঞ্চল পাহাড়ি নদীর হাত ধরাধরি করতে করতে বেশ বেলা থাকতেই পৌঁছে গেলাম রোটাং। অসম্ভব ঠান্ডা হাওয়া, উড়ন্ত মেঘে ঝাপসা চারিধার। অবাক হলাম, একটুও বরফ নেই দেখে। এমনটা আশা করিনি। একটু ঘোরাঘুরি করে আবার গাড়িতে উঠতে যাবো, আন্দুলের সেই বাইকার্স টিমের সঙ্গে দেখা। কিছু কথাবার্তা হলো, সাথে আবার দেখা হবার আশ্বাস।

মানালির কিছুটা আগে মুঠোফোনটা হঠাৎ জেগে উঠলো। উচ্চস্বরে তা জানান দিচ্ছে অনর্গল। কি আনন্দ তখন! প্রায় ৫ দিন তার মায়াজালের বাইরে। সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। নিকট বন্ধুরা কোনও খবর না পেয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন। মানালি পৌঁছলাম যখন তখন পড়ন্ত বিকেল। হোটেলে লাগেজ নামিয়ে কর্মার বিদায় পর্ব। যাবার আগে আবার আসার প্রতিশ্রুতি। হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর বিনিময়।

সুন্দরী হিমাচলের মধ্যমণি মানালির প্রতি যেন এক মন-টানা ভালোবাসা আমার। এবার নিয়ে চতুর্থ বার এখানে আসা। লাদাখ থেকে ফেরার পথে একটু ছুঁয়ে যাওয়া। অল্প সময়ে যতোটুকু উপভোগ করা যায় আর কি! চঞ্চল বিয়াসের নুড়ি পাথর টপকে ছুটোছুটি . . . কখনো নীল আকাশে মেঘের মুখ ঢাকা আদরের জলছবি বিয়াসের গায়ে। মানালির বাজারের আকর্ষণও খুব কিছু কম নয়।

হাতে সময় খুব কম। কালই দিল্লি যাবার বাস। চটপট তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এবার প্রায় আট বছর পর এখানে। পরিবর্তনটা বেশ চোখে পড়ার মতো। রাস্তাঘাট ঝাঁ চকচকে। আলো ঝলমলে সন্ধ্যের মানালি। ফুচকা থেকে আইসক্রিম সবই আছে। রঙবেরঙের শীতের পোষাক চোখ টানছে। কেনাকাটা করে হোটেলে ফিরে শুনি, ডিনার রেডি। ডিনার সেরে ক্লান্ত শরীরে নরম বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে আসছে। হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। খুলে দেখি আমাদের সঙ্গী নব-দম্পতি কীর্তি আর রেয়াংকা কেক হাতে হাজির। ঘড়িতে ঠিক রাত বারোটা। আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। মেয়ে তো ভীষণ রকম অবাক। হাসি গল্পে আনন্দে ঘন্টা খানেক এমনিই কেটে গেলো। ততক্ষণে চোখ জুড়ে ঘুম নেমেছে। বেশ দেরিতেই ঘুম ভাঙলো। তেমন তাড়া কিছু নেই। এতো দিন ঝড়ের মতো উড়েছি অজানা কে ছোঁয়ার আশায়। আজ যেন শরীর মন দুই-ই অবসন্ন। রুম থেকে বেরিয়ে বাইরে ব্যলকনিতে এসে দাঁড়ালাম। হোটেলটা নানা রঙের পাহাড়ি ফুলে সুন্দর সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁ হাতে ডাইনিং হল। ব্রেক ফাস্ট টেবিলে তখনও সবাই বসে। আমি কফি হাতে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতের একদম কাছেই আপেল গাছে আপেল ঝুলে আছে থোকায় থোকায়। যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবো ! ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোতে একটু বেলাই হলো। পায়ে পায়ে মানালির আশপাশ ঘুরে টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে ঢুকলাম শের-ই-পাঞ্জাব এ। আজ স্পেশাল বার্থডে লাঞ্চ। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভিতরে আলো আঁধারিতে কাঁসার পাত্রে খাওয়ার আয়োজন। যেন পাঞ্জাব এর কোনো গ্রামের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি এমন মনোরম অন্দর সজ্জা। খাওয়া শেষ করেই বাস ধরার তাড়া। সময় খুব কম। হাতে ধরা আইসক্রিমটা তখনও শেষ হয়নি, লাগেজ আনতে ছুটলাম হোটেলে। স্মার্ট সুন্দরী ঝকঝকে মানালিকে বিদায় জানিয়ে মালপত্র বাসের পেটে পুরে পাঁচটার একটু আগে আমাদের ভলভো রওনা দিলো দিল্লির উদ্দেশ্যে। দূর থেকে কাঁচের জানলা দিয়ে এক দৃষ্টে বিয়াসের দুষ্টুমি আর অভিমানী আকাশের সাথে লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে কখন যে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো বোঝাই গেল না। বিয়াসকে এবার ছুঁতে না পারার দুঃখ নিয়েই ছুটে চললাম দিল্লির দিকে। সেখান থেকেই কালকের বিমানে আমাদের ঘরে ফেরা।

চলন্ত বাস থেকে তোলা বিয়াসের এক ঝলক

অসম্ভব সুন্দর স্মৃতি দুচোখে মেখে, বুকে মন খারাপের মোচড় নিয়েই শেষ করলাম আমাদের ১১ দিনের লাদাখ অভিযানের ইতিকথা। অনুভব করলাম বাড়ি ফেরার ডাক, একটা অভ্যস্ত জীবনের সুখ। আবার বেরিয়ে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম অন্য কোন পথের সন্ধানের, অন্য কোনো সুন্দরী প্রকৃতির রূপের রহস্য আস্বাদনের।

(সমাপ্ত)

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

বইপাড়া

এই বিভাগে পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে নতুন নতুন বইয়ের। পাঠকরাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? আপনারও কোনো বই পড়ে ভালো লাগলে, সেটির সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পরিচিতি লিখে পাঠান বাতায়নের ই-মেল ঠিকানায়, mailtomanas2014@gmail.com

পরিচয় - ২

কিস্তিমাত – উপাসনা সরকার

প্রকাশক – দাঁড়াবার জায়গা

গতবারের বইমেলাতেই আলোড়ন ফেলেছিল উপাসনা সরকারের কবিতার বই। সাহসী উচ্চারণে নবীন কবির এই প্রথম প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন বেশ কিছু অগ্রজ কবিও। কবিতার অন্দরমহলই তাঁর অন্তরমহল আর অন্তরে আজো সাদা পাঞ্জাবী সোনালি ফ্রেমের চশমায় পিতৃস্নেহ অমলিন। তাঁর এই বই উৎসর্গ তাঁর পিতাকে। শূণ্যের ক্ষমতা দিয়ে শুরু করে ভূগোলের দিদিমণির তথ্য বিশ্বাসী কবিতা মনে দাগ কেটে যায়। তাঁর "ধর্মবারুদ" কবিতা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। সরীসৃপের মত জড়িয়ে ওঠা ছাতিমের গন্ধ তাঁর কবিতায় বৃষ্টি নামায়। স্মৃতির ভান্ডার উপচে গিয়েও কেউ থাকে না আশেপাশে। রাজনীতির গুণ ভাগে পড়ে থাকা বিয়োগ "ভেসে যাই" কবিতায় অনবদ্য ভঙ্গীতে বিবৃত। তাঁর কবিতায় ঈর্ষার চোরা চাউনিতে বয়ঃবৃদ্ধি হয় নবজাতকের। হাসপাতাল, জমা জল, হাত বাড়িয়ে একলা মেয়ের খুঁজে বেড়ানো তার হারিয়ে ফেলাকে, চোখ ভিজে যায় তাঁর "একবার আসবে" কবিতায়।

ইস্ত্রি না করা জামার ভাঁজে টিনের বাক্সবন্দি না বলা কথা শুনতে গেলে একবার হয়ত পাতা উলটে দেখতে হবে উপাসনা সরকারের কবিতার বইটি।

বাতায়ন
“৫এ পা”

কোলকাতা - ৭০০ ০২৫

বাতায়ন

বাতায়ন
"৫এ পা"

BONGO SANSKRITI AUSTRALIA, CANBERRA